শ্রীমতী সংবাদ

অমরেন্দ্র দাস

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

যে সব নারীরা ঘর পায় না, বর পায় না, পেয়েও যারা শান্তি পায় না, যারা শুধুই নির্যাতিতা, উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা…

সেই সব শ্রীমতীদের উদ্দেশ্যে -

শ্রীমতীদের কান্না বুঝি আজও মেলায়নি

যুগ পাল্টেছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও পাল্টে গেছে। কিন্তু মানুষের কতকগুলি সমস্যা চিরন্তন তা পাল্টায় না। সে সমস্যা নারীদের। ঈশ্বরের এই অপূর্ব সৃষ্টি যার তুলনা কোন কিছুতে মেলে না। তার অবমাননাও বুঝি কোনদিন শেষ হবে না। নারী নিজে তার শারীরিক সৌন্দর্য নিয়ে মহিয়সী কিন্তু গোলাপে যেমন কাঁটা থাকে, নারী তার দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে নিজেই তার আগুনে পুড়ে মরে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আরও ব্যাখ্যা এসে পড়ে কিন্তু তা সংবরণ করে এ উপন্যাস প্রসঙ্গে দু একটি কথা জানাই। আজকে আপনারা পণপ্রথার বলি, বধূহত্যার হিড়িক লক্ষ্য করছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এমনি বহু বিবাহের হিড়িক লেগেছিল। কুলীন ব্রাহ্মণরা কচি কচি মেয়েগুলিকে একদিনের জন্যে বিয়ে করে ছেড়ে দিত জনসমাজে। সেই সব কিশোরী যুবতীদের লুটেপুটে খেত সুযোগসন্ধানীরা। ইংরেজরাও অবাক হয়েছিল এদেশের মানুষদের আদবকায়দা দেখে। আমাদের দেশের মানুষ যে কত জঘন্য সেটা ইংরেজরা জানত বলেই আমাদের অস্ত্র আমাদের ঘাড়ে প্রয়োগ করেই কার্য উদ্ধার করেছিল। আজও কি এদেশের মানুষ আমাদের মেয়েদের এতটুকু সম্মান দেয়? তাহলে বধূহত্যা হয় কেন?

ভারতীয় নারীদের এই জঘন্য ইতিহাস জানবার জন্য বিশ্বে একটা কৌতূহল আছে। এ বই প্রথম যখন প্রকাশ হয়েছিল, যুরোপ থেকে সুধীজনেরা আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখকের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজেদের বাড়ির মেয়েদের কথা অপরকে জানাতে কি ভাল লাগে?

অমরেন্দ্র দাস

এই লেখকের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থ

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বেগম রিজিয়া
জেবুন্নিসা
নজরানা
সরদানা
বাঈ বেগম বাঁদী
নর্তকী নিকী
সিরাজের ফৌজী
রমনাবাঈ
দিলবাহার
নেভে নাই দীপ
এই সেতু সেই সেতু
ইমনরাগের সানাই
বেকসুর খালাস
বিদ্রোহিনী
ক্রীতদাসী
বেলোয়ারী বিলাস
শনিবারের সম্রাট
পুতলীবাঈ
কালিঘাটের ঘরসংসার
ঐতিহাসিক রচনা সমগ্র ১—৬ খণ্ড

প্রবন্ধ

রাজনারায়ণের কলকাতা
শরৎচন্দ্রের নারী সমাজ ও
সেকালের একালের
বারবনিতা
সংস্কারে আবদ্ধ নারী

পৌরাণিক উপন্যাস

রূপে অরূপে মহামায়া
হিমালয়কন্যা পার্বতী

সামাজিক উপন্যাস

নূপুর ছন্দ
অশ্রুতরঙ্গ
স্থূলতার স্বর্গ
এ পৃথিবী স্বর্গ নয়
আকাশ কন্যা
পটে আঁকা ছবি
নীলপদ্মের আলপনা
আলেয়া মঞ্জিল
আলোর লগন
তিতিক্ষা
কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি
রঙ বদলায়
দিন বদলায়
তবু আকাশ রাঙা
কুহুকুহু
বিবর্ণ পলাশ
দুজনের সঙ্গে দুজনে
দুই পতিতার গল্প

গল্পগ্রন্থ

মেমবৌ
লুডো
শ্রেষ্ঠ গল্প

কিশোর উপন্যাস

নাম নেই ছেলেটির
অদৃশ্য দেবতা
কিশোর ঐতিহাসিক সমগ্র ১—৫ খণ্ড

নাটক

এর শেষ নেই
ক্রীতদাসী
অপ্সরা

দ্ুপাশে ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে এবড়ো খেবড়ো মেঠো পথ, কোথাও গর্ত, কোথাও গরুর গাড়ির চাকার দাগ পড়ে সরু নালার সৃষ্টি হয়েছে। সেই পথ দিয়ে তিতুরাম গাঙ্গুলী এগিয়ে চলেছে। ঠিক সে হাঁটছে না, রীতিমত দৌড়চ্ছে। রোদের তাপ বাড়ছে। রোদের তাপের জন্যে সে মাথায় বসানো গামছাটা একবার পরীক্ষা করে নিল। না, গামছাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

ইতস্তত চোখ ঘোরালো। কাছাকাছি কোথাও পুকুর দেখতে পায় কি না কিন্তু দেখতে পেল না। এইতো আধঘণ্টাও হয় নি বরিজহাটী থেকে ফেরবার পথে পুকুরে নেমে স্নান প্রাতঃকৃত্য সেরে গামছাটা ভিজিয়ে মাথায় দিয়েছিল।

মেয়েটির নাম বোধ হয় বিমলাই। খাতাটা দেখলে নামটা সঠিক জানা যাবে। আর নাম জেনে কি হবে? ব্যবসা ব্যবসাই। ব্যবসার খাতিরে যেটুকু দয়া-মায়া তার বেশি তিতুরাম করতে পারে না। কিন্তু ওরা যা বলেছিল তার সবটাও করতে পারে নি।

বিমলার বাবা শ্যামাচরণ একান্ত মিনতি করে শ্বশুর হয়ে জামায়ের পা ধরেছিল। অবশ্য শ্বশুর না সে। মেয়েটা ডাগর হয়েছে বলে বিয়ে দিয়ে কুলরক্ষা করেছে। তা না হলে শ্যামাচরণ তো ছেলের মত। এতদিনে কোথায় কটা ঐ বয়সী ছেলে মেয়ে তার আছে, তিতুরাম জানে না। তা সেই পা ধরতে তিতুরাম মনে কিছু করে নি। শ্যামাচরণ কথা দিয়েছিল, আপনি বিশ্বাস করুন জামাইবাবা, আমি আপনার পাওনা যোগাড় করে আনবই। তা তিতুরামের পাওনা এমন কি বেশি? তাদের জাতে যারা এই ব্যবসা করছে, তারা এর চেয়ে ঢের বেশি নেয়। তিতুরামের বয়েস হয়েছে বলে সে পাওনা-গণ্ডাটা একটু কমিয়ে নিয়েছে। আগেই শ্যামাচরণের পত্রোত্তরে জানিয়েছিল, আমি একরাত থাকবো তার ভিজিট পঁচিশটা নগদ টাকা, একজোড়া নতুন কাপড়, দুজোড়া নতুন গামছা, দশ সের চাল। এই তো গেল ভিজিট। শুধু এই ভিজিট দিয়ে জামাই আদর করলে চলবে না। যখন জামাই অন্যত্র যাত্রা করবে সঙ্গে হাড়ি করে ভাল ভাল মিষ্টি, চিড়ে মুড়ি পুঁটুলী করে, পুঁটুলীর কাপড় নতুন মার্কিন হবে, তাছাড়া নিজের ক্ষেতের আনাজ তরকারী একটা নতুন ঝুড়ি করে দেবে। এই সামান্যই এক রাতের থাকার ভিজিটস্বরূপ তিতুরাম চেয়েছিল। অন্য কেউ হলে তো ঐ নগদ টাকারই চতুর্গুণ চাইত। তা শ্যামাচরণ সব দেবে বলেই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু যখন সে এল এই কাণ্ড করল। একেবারে দুটো পা জড়িয়ে ধরল। তিতুরামের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। এরকম তো ভাল কথা নয়। কথা যা কাজ তাই। শ্যামাচরণ সবটাই মকুব করে দিতে বলেছিল। নগদ তো দিতেই পারবে না। একখানা গামছা আর কাপড় দিতে পারবে তা সে গামছা কাপড় এখনও কেনা হয় নি। টাকা যোগাড় করে তারপর কিনে আনবে।

তিতুরামের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। শ্যামাচরণের অবস্থাটা তো এত খারাপ ছিল না! তার যতদূর মনে পড়ে, তিন বছর আগে যখন এ বাড়িতে বিয়ে করতে এসেছিল, বেশ ভাল করে খোঁজ খবরই নিয়েছিল। তিতুরামের আবার অভ্যেস, একটু অবস্থাপন্ন না হলে সে সেবাড়ির জামাই হতে চায় না। ব্যবসাই যখন করছে, তখন ভাল পার্টির সঙ্গে কাজ করা ভাল। সারা বছর যদি খাতির যত্ন না পেল তাহলে তার চলবে কেমন করে? আর তাছাড়া এই ব্যবসাই তো আঠারো বছর বয়েস থেকে শুরু করেছে। পাঁচের কোঠা পার হতে চলল। ব্যবসার নগদ ব্যাপারটা যদি এ বয়েসে না বুঝবে তাহলে আর কবে বুঝবে?

অবশ্য তিতুরাম গাঙ্গুলী সেই আঠারো বছর বয়েস থেকেই ব্যবসাটা পুরোপুরি শিখেছিল। ওর মামা রাখহরি মুখোপাধ্যায় এই ব্যবসা করত। আর শুনেছিল ওর মা সারাজীবন মামার বাড়িতেই বাস করে আসছে। কারণ ওর বাবা সেই যে কুলরক্ষে করে চলে গেছে আর আসে নি। মামাদের পয়সার জোর কম, পয়সা না দিলে বাবা আসবে কেন?

তা তিতুরাম কি করে মার পেটে এল? ছোটবেলায় সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মেজমামাকে। মেজমামা একটু রগড়ে মানুষ, চোখ তুলে আকাশ দেখিয়ে বলেছিল, ঐ যে ওখান থেকে ঝুপ করে পড়লি!

তিতুরাম ছোটবেলায় একটু শান্তশিষ্ট স্বভাবের বোকা ধরণের ছেলে ছিল। মেজমামার কথা শুনে শুধু আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। ওর ধারণা এমনি যদি আকাশ থেকে আর একটা ছেলে পড়ে ভাই হয়ে যায়? ও খুব স্বার্থপর ধরণের ছেলে ছিল। মার আদর সে একাই ভোগ করতে চায়, কাউকে ভাগ দিতে চায় না। সেইজন্যে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে মেজমামা জিজ্ঞেস করেছিল, কি রে অমন করে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিস কেন? তিতুরাম লজ্জায় মার আঁচলের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিল।

কিন্তু বড় হয়ে সবই জানতে পেরেছিল তিতুরাম। প্রথমে শুনে ওর মুখ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কারুর সঙ্গে কদিন কোন কথাই বলে নি। মার দিকেও তাকায় নি ভাল করে। আর নিজের ওপর দারুণ একটা ঘৃণার ভাব জেগেছিল। তারপর চতুর্দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিল। তখন তার মধ্যে যৌবনের উঁকিঝুঁকি শুরু হয়েছে। নরনারীর ভাব-ভালবাসার একটা ইঙ্গিত নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করছে।

সেই সময়ে একটা ব্যাপারে তার লক্ষ্য গেল। কৈলাস চাটুজ্যের মেয়ে মনোরমা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। অথচ তার স্বামী নেই। যে কুলরক্ষা করে গেছে, সে আর এ পথ মাড়ায় নি। গ্রামের মধ্যে সেই নিয়ে খুব জটলা। তিতুরামের কানেও গেল, মনোরমা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে তার আসল ছেলের বাপ গ্রামের রাঘব। রাঘবের সঙ্গে তিতুরামের আলাপ ছিল আলাপ কেন বেশ বন্ধুত্ব।

রাঘব অবশ্য তিতুরামের মত অত শান্ত স্বভাবের নয়, বয়সও দু'এক বছরের বড়। তিতুরামের বয়স তখন চলছে আঠারো, রাঘব কুড়ি। রাঘবের কুড়ি বছরের দেহ যেন শাল গাছের মোটা গুঁড়ি, যেমন বুকের পাটা, তেমনি হাত পা।

তিতুরাম জিজ্ঞেস করেছিল রাঘব, গ্রামের মধ্যে কি শুনছি ?

রাঘব বলেছিল, কি ?

তুমি নাকি কৈলাস চাটুজ্যের মেয়ের ছেলের বাবা ?

রাঘব হাঃ হাঃ করে হেসেছিল। যা শুনেছ তা ঠিকই। মা হ'তে চাইল মেয়েটা। তা আমি আর কি করি বলো ? কথাটা কি ফেলতে পারি ?

তা কাজটা কি ভাল হল ? ঐ মেয়ের ছেলের পিতৃপরিচয় কি হবে ?

কেন মনোরমার স্বামীর নামেই হবে ?

স্বামী যদি স্বীকার না করে ? সেই নিয়েই তো গ্রামে জটলা হচ্ছে। তাছাড়া কৈলাশ চাটুজ্যের অর্থ সামর্থ নেই যে জামাইকে আনবে।

হঠাৎ রাঘব তিতুরামের দিকে একটু তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল, তোর আসল বাবা কে জানিস্ ?

তিতুরামের যেটুকু সহজ দৃষ্টি ছিল, ম্লান হয়ে গেল।

রাঘব তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, না না আমি তোকে আঘাত দেবার জন্যে এসব বলি নি। আমাদের ব্রাহ্মণদের যা ধরণধারণ চলছে তারই সম্বন্ধে একটা ব্যাখ্যা দেবার জন্যেই তোর উদাহরণটা তুলে ধরেছি। আসলে তো আমাদের সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে যা কিছু বলা যায়। কচি কচি মেয়েগুলোকে কুলরক্ষার ফিকিরে বলি দিচ্ছে। তারা কিভাবে কামনা-বাসনাকে বাদ দিয়ে জীবন কাটাবে বল্। জাতের দোহাই দিয়ে কি মেয়েগুলোর সর্বনাশ করা হচ্ছে না।

তিতুরাম রাঘবের বাড়ি ছেড়ে কৈলাশ চাটুয্যের বাড়িও গিয়েছিল। ঠিক রগড় দেখতে নয় তার জন্মের আসল সূত্রটুকু খুঁজতে। কেন মা তার জন্ম এইভাবে দিল ? কেন বাবার ঔরসজাত সন্তান সে হলো না ? ব্রাহ্মণ ধর্মের কুলরক্ষার জন্যে এই মাথা ব্যথা কেন ? তাছাড়া তিতুরাম ছোটবেলায় বাংলা সংস্কৃতটা কিছু শিখে নিয়েছিল। ওর এক মামা পণ্ডিত বলে তখনকার দিনে লোকের খাতির পেত। সেই মামার আওতায় ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের বংশানুক্রমিক ইতিহাসগুলো একটু উল্টে পাল্টে দেখেছিল। কৌলীন্য-মর্যাদা-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় শ্রোত্রিয়, তৃতীয় বংশজ, চতুর্থ গৌণ, পঞ্চম পঞ্চগোত্র বহির্ভূত সপ্তশতী

সম্প্রদায়। কুলীনেরা কুলীনের সঙ্গে আদান-প্রদান করতে পারবে। শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করতে পারবে না। করলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজ ভাবাপন্ন হবে। আর গৌণ কুলীনেরা কন্যাগ্রহণ করলে এককালে কুলক্ষয় হবে। এইজন্যে গৌণ কুলীনেরা কুলের শত্রু। কুলাভিমানী মহাপুরুষেরা কুলের শ্রেষ্ঠ হয়ে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও ধর্মানুযায়ী হলে হয়ত কোন ক্ষতি হত না কিন্তু তাদের আচরণ হল জঘন্য ও ঘৃণাস্পদ। কন্যা-সন্তানদের সুখদুঃখের কথা তাঁরা মনে স্থান দিলেন না। শুধু তাঁদের লক্ষ্য থাকল যেন কন্যাদের স্বজাতির ঘরে বিয়ে হয়।

কিন্তু কুলীন পুরুষেরা অনেকগুলি বিয়ের দিকে মন দিলেন। এবং সেই থেকে বংশজ ভাবাপন্ন জাতের উদ্ভব হল। এই বংশজদের আবার ইচ্ছা, তারা কুলীনকে কন্যা দান করবে। একজন কুলীনের যদি অনেকগুলি পুত্র থাকে। দু-একটি পুত্রের সঙ্গে এই বংশজ কন্যাদের বিয়ে দিলে লাভ ছাড়া লোকসান নেই বরং প্রাপ্তি যোগটা ভাল হবে। এই ভেবে কুলীনরা ব্যবসায় নেমে পড়লেন। বিয়ে করা ছাড়া কোন ভার নিতে হবে না সুতরাং বিয়ে করলে ক্ষতি কি? এইভাবে বহু বিবাহের প্রচলন হল।

তিতুরাম তার মামা রাখহরি মুখোপাধ্যায়ের কাছে তালিম নিয়েছিল। রাখহরি মুখোপাধ্যায় অনেক বিবাহ করেছিল কিন্তু একটি স্ত্রীকেও নিজের ঘরে আনে নি। বিয়ের কথা প্রথম তো শুনে তিতুরাম অবাক হয়ে মামার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। ওর তখন বয়স আঠারো—মামা একটিও মামীকে আনতে ইচ্ছে করে না?

তার উত্তরে মামা বলেছিল, দূর, আনলে কি ব্যবসা চলবে? তাছাড়া কোন মামীকে যদি ঘরে আনি, তাহলে কি সে আর এই ব্যবসা করতে দেবে? বুকের ওপর উঠে বসবে না?

তিতুরামের দৃষ্টি তখন কল্পনার রঙে ডোবানো। অবাক হয়ে মামার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তারপর নিজেকে শোনাবার মতই মৃদুস্বরে বলেছিল, মামীরা আসতে চায় না?

আসতে চাইবে না কেন? আনলে তো! ওরা, কুলীনের সঙ্গে বিয়ে হয়েই, বাপের বাড়িতে থাকা অভ্যাস করে নিয়েছে। একটু আধটু কান্নাকাটি করে বটে, তারপর সব ঠিক হয়ে যায়।

তিতুরামও কুলীনের ছেলে, তার মা কুলরক্ষার জন্যে আ-জীবন ভাইয়ের বাড়িতে থেকেছে। তিতুরামের তখনও এই ব্যবসার দিকে মন যায় নি। তার মন তখন হৃদয় ভাবাবেগে পূর্ণ।

কৈলাস চাটুজ্যের বাড়ি গিয়ে দেখেছিল মনোরমার অবস্থা। মাটির চালের ঘরের দাওয়ায় মনোরমা একান্ত অপরাধিনীর মত চুপ করে বসে আছে। গৌরবর্ণ মুখখানি তার অপমানে লাল। গ্রামের লোক তাকে নানাভাবে বোঝাচ্ছে। নারী পুরুষ

সবাই আছে। বিশেষ করে মেয়েরা এমন সব কথা বলছে কানে আঙুল দিতে হয়। কেউ কেউ আবার ব্যাভিচারের জন্যে গলায় দড়ি দিতে বলছে। তিতুরাম সবই শুনল।

ওদিকে কৈলাস চাটুজ্যেকে অনেকে উপদেশ দিচ্ছে, এখনি জামাইবাবাকে আনতে লোক পাঠাও। সে এসে পিতৃত্ব স্বীকার না করলে তোমার জাতিনাশ ঘটবে।

কৈলাশ চাটুজ্যে বললেন, আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি। জামাইকে আনা খুবই মুস্কিল। আর যদিও আসে তার এত চাহিদা যে আমার সামর্থ্যে কুলোবে না।

এই সময়ে একজন বয়স্কারমণী (মনে হয় একটু মুখরা) এগিয়ে এসে নেচেকুঁদে হাত পা নেড়ে বলল, তাহলে কি মনো কুলটা নাম নিয়ে সমাজে বাস করবে? এরকম তো আমাদের সমাজে আকচার হচ্ছে। স্বামী এসে স্বীকার করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। পেটের ছেলে যারই হোক।

কৈলাস চাটুজ্যে মাথা নেড়ে বললেন, অসম্ভব। আমার সামর্থ্য থাকলে আমি করতাম। এটা অবশ্য সত্যি কথা, কৈলাস চাটুজ্যের একটিমাত্র মেয়ে, সন্তানও ঐ সবেধন নীলমণি। তার জন্যে কিছু করতে পারলে সেই হয়তো সবচেয়ে খুশি হত। কিন্তু সামর্থ্য যদি না থাকে তাহলে কি করা যাবে?

তিতুরাম তারপর ঐ বাড়ির সীমানা ছেড়ে চলে এসেছিল। এসব দেখতে তার ভাল লাগে নি। যদিও সেও ব্রাহ্মণের ছেলে, উল্লাস জাগাই উচিত, কিন্তু সেও তো একইভাবে পিতৃপরিচয় না পেয়ে অন্তর বেদনায় দগ্ধ হচ্ছে। যদিও মামারা এই গ্রামে হাঁকডাক করা মানুষ, কেউ কিছু বলতে সাহস করে না কিন্তু না বললেও যা অপ্রকাশিত থাকে তা তো অস্বীকার করা যায় না।

দুদিন পরে শুনল তার সেই পণ্ডিত মেজমামাই বললেন, দিয়েছি কৈলাস চাটুজ্যের মেয়ে মনোর একটা হিল্লে করে। ভগবান মুখোপাধ্যায় খুবই আস্ফালন করছিল, এই চাই ঐ চাই। কৈলাস চাটুজ্যের তো কাঁদ কাঁদ মুখ। জোড়হাত করে শুধু কাঁদতে লাগল। আর কাতর প্রার্থনা, অনুগ্রহ করে আমার মেয়েটাকে উদ্ধার করে দিন। লোক দাঁড়িয়ে গেছে কাতারে কাতারে। সকলেই রগড় দেখছে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। আমি ভীড় দেখে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকি। আর ভগবান মুখোপাধ্যায় আমাকে দেখে একেবারে জড়োসড়ো। আর মুখে রা-টি কাড়তে পারে না, ওর তো অনেক গলদ জানি। ভঙ্গকুলীন হয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। আমিই ওকে বললাম, যা পাচ্ছ নিয়ে নাও, মেয়েটাকে স্বীকৃতি দিয়ে দাও। তা ভগবান মুখোপাধ্যায় আর কথাটি বলে নি, সারারাত থাকার অঙ্গীকার করে কৈলাস চাটুজ্যে যা দিয়েছে তা হাত পেতে নিয়েছে।

একটা ছায়া দেখে তিতুরাম গাঙ্গুলী একটু দাঁড়াল। মাথা থেকে গামছাটা নামিয়ে নিল। মাথার চুল অনেক পাতলা হয়েছে। অনেক সাদাও হয়েছে। গাছটার দিকে তাকাল, ঠিক করতে পারল না কি গাছ! জামরুল গাছ কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। ও গাছটার তলা থেকে সরে দাঁড়াল। এখন যদি গাছের ওপর থেকে পক্ষীকুলের কেউ মলত্যাগ করে তাহলে আবার তাকে কোন পুকুরে নামতে হবে!

কাছাকাছি কোথাও কোন পুকুর নেই। এসব পথ তিতুরামের চেনা। হুগলী জেলার কোন্ গ্রাম সে না চেনে? খাতাখানা এখুনি থলি থেকে বের করলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অভিজ্ঞতার ঝুলি তো ঐ খাতাই। অভিজ্ঞতা বলো ব্যবসা বলো, সবই ওর মধ্যে আছে। আঠারো বছর থেকে এই পাঁচের কোঠা যায় যায়।

এসব ব্যবসার মধ্যে তিতুরাম ঢুকবে না বলেই মনস্থ করেছিল, মা ও মনোরমার দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখে মেয়েদের ওপর কেমন যেন তার একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, মায়াই বলবে সে। মনোরমার ঐ অবস্থায় যেমন ওর ওপর রাগ করতে পারে নি, তেমনি রাঘবকে ক্ষমা করেছিল। এই রকম তো বহু ঘরে দেখেছে। কুলরক্ষার জন্যে ব্রাহ্মণ কুলে যেমন মাথা ব্যথা, কুল রক্ষা হবার পর মেয়েগুলোর অবস্থা কেউ ভাবে না। যেন তারা বিধবা। আজীবন শাঁখা সিঁদুর, রঙিন কাপড় পরে মাছ ভাত খেয়ে বেঁচে থাকা। আর স্বামীর মৃত্যুর খবর এলে পুকুর ঘাটে গিয়ে বিধবার সাহায্যে শাখা ভেঙে সিঁদুর তুলে থান কাপড় পরে ফিরে আসা। তিতুরাম দেখেছে, সেই সব মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে। ওদের চোখে কোনো জল নেই। কেউ কেউ আবার হাসেও খিল খিল করে।

যে বিধবারা তাদের দলের করে নিতে আসে তারা এই বাচাল মেয়েদের দেখে গালে ঠোনা মেরে বলে, কি রে ভাতার খাকী মেয়ে হাসছিস্ কেন লা। কাঁদ, সোয়ামী মরেছে, একটু চোখে জল আসে না?

বাচাল মেয়ে উত্তর দেয়, চোখে যে জল আসছে না ভামিনী পিসি, কি করব বলো?

সোয়ামীকে একটু ভালবাসতিস না!

বাহ্ বললে বেশ কথা ভামিনী পিসি। সোয়ামীকে দেখলুম কবে যে ভালবাসব?

ভামিনী পিসি মেয়ের কথা শুনে থ। কিন্তু ডাক ছেড়ে কান্নার মেয়েও দেখা গেছে। আর ঐ মেয়ে দেখে বিধবারা সত্যিই বিগলিত। সত্যিই দেখা গেল, স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনে আছড়ে পড়ল দাওয়ার ওপর পতীপ্রাণা চোদ্দ বছরের ক্ষান্তমণি।

সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে মেয়েরা রান্না ছেড়ে, ধান ভাঙা ফেলে ছুটে এল। ক্ষান্তমণিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সে কি কথার ফুলঝুরি!

ক্ষান্তমণি তবু মরা কান্না থামাতে পারে না। তার মুখ দিয়ে যেসব কথা বেরোয় মনে হয় স্বামী যেন তাকে কত সোহাগে এই পাঁচ বছর রেখেছিল। কিন্তু পরেই এই ক্ষান্তমণির মুখ থেকে অন্য কথা শোনা যায়। অবশ্য ঐ কথাটা তিতুরাম এক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছিল। যার মুখ কোনদিন দেখলুম না তার জন্যে আবার কান্না?

তাহলে তুই সবার সামনে এমনিভাবে কাঁদলি কেন?

বাহ্ না কাঁদলে যে ওরা আমায় বেহায়া বলত!

তিতুরামের মামা রাখহরি মুখোপাধ্যায় এ ব্যবসায় খুব পাকা হয়ে গিয়েছিল। যখন তখন টাকা পয়সা জিনিস পত্তর নিয়ে বাড়ি আসত।

মা জিজ্ঞাসা করত, দাদা, আজ কোথা থেকে এলে? বিয়ে ছিল না পুরোনো শ্বশুর বাড়ি ঘুরে এলে?

বিয়ে থাকলে মামা বিয়ের গল্প বলত, আর শ্বশুর বাড়ি গেলে তার গল্পও বলত। তবে বিয়ে থাকলে আর রাখহরিকে বিয়ের গল্প বলতে হত না, মা জিনিস পত্তর তুলতে তুলতেই সব বুঝতে পারত। কত টোপর যে আলমারীর মাথায় রাখতে দেখেছে তিতুরাম, তার ইয়ত্তা নেই।

ঐ টোপর নাকি নষ্ট করতে নেই, অমঙ্গল হয়। একবার তিতুরাম একটা টোপর আলমারীর মাথা থেকে পেড়ে সঙ্গীদের নিয়ে বর-বউ খেলা খেলতে বসেছিল।

মা হাঁ হাঁ করে কোথা থেকে ছুটে এল। তিতুরামের গালে একটা চড়ও বসিয়ে দিল। পাজী ছেলে, বলা নেই কওয়া নেই এই সব নিয়ে খেলা? আবার যদি কোন দিন দেখি তাহলে পিঠের ছাল তুলে দেব।

অতগুলো টোপর আলমারীর মাথায় রয়েছে! কত তো গুড়ো গুড়ো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। শোলার জিনিস কি বেশি দিন থাকে? কিন্তু মায়ের ঐ আচমকা গালে চড় মারার দাগটা বহুদিন ছিল।

তিতুরাম যখন ছোট ছিল, অনেক কথারই অর্থ বুঝতে পারত না। যেমন মেজ মামার রগড় করে বলা তার জন্মের ইতিহাস। তাছাড়া সে শান্তশিষ্ট ধরণের ছেলে ছিল। এই ঠাণ্ডা মেজাজের জন্যে কত ছেলের কাছ থেকে মার খেত।

পাঠশালার পণ্ডিতমশাই তিতুরামকে দেখলেই বলতেন, কি রে আজ তো তোর মামা অনেক কিছুই এনেছে, আমার জন্যে কি আনলি?

পণ্ডিত মশাই ছাত্রদের কাছ থেকে চাল, ডাল, কলা, মুলো সব সময়েই পেয়ে থাকেন কিন্তু তিতুরাম ওসব আনবে না। সন্দেশ, রসগোল্লা, কাপড়, গামছা। এটা নাকি মামার সঙ্গে পণ্ডিতমশাইয়ের রফা হয়েছিল। তার বোনপোকে পণ্ডিতমশাই শিক্ষা দেবেন, তার পরিবর্তে মামা তাকে এই সব যোগাবে।

একবার পণ্ডিতমশাইয়ের একটা গামছা খুব দরকার পড়েছিল। ক'দিন ধরে মামার কাছ থেকে চাইছেন কিন্তু মামা দিচ্ছেন না। তিতুরাম ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। হঠাৎ একদিন রাগের বসে পণ্ডিতমশাই তাকে বেত দিয়ে মারলেন। এত মারলেন যে সারা শরীরে দাগ পড়ে গেল।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে ঢুকতেই মামার সামনে পড়ে গেল। রাখহরি জিজ্ঞাসা করল, তুই কাঁদছিস কেন রে?

তিতুরাম ব্যাপারটা মামাকে বলতে চায় নি। আর মামা যে এ সময়ে থাকবে তাও সে ভেবে পায় নি। পণ্ডিতমশাইয়ের মারের প্রচণ্ডতায় তার শরীরের অনেক জায়গা কেটে গিয়ে ফুলেও গিয়েছিল।

মামা কাছে এসে হাত ধরে বলল, কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে তোর? হঠাৎ ওর লক্ষ্য পড়লো গালের পাশে কান ঘেঁষে একটা ফোলাদাগ। লাল হয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। বেত মারার দাগ এমনিতেই বোঝা যায়। মামার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। এমনিতে মামা খুব রাগী লোক। হুম শব্দ করে বলল, কে মেরেছে, পণ্ডিত?

তিতুরাম চুপ করে রইল।

কি করেছিলিস তুই?

কিছু না মামা। আমাকে তো যা পড়া দিয়েছিলেন করেছিলুম।

মামা আর দাঁড়াল না। তীর বেগে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

মা ছুটতে ছুটতে এসে বলল, তিতু, তোর মামা অমন রেগে কোথায় গেল রে?

তিতুরাম দেখল মা ঘাট থেকে স্নান করে ভিজে কাপড়ে কলসি কাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনও মায়ের কাপড় চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠোনে জল পড়ছে ঝর ঝর করে।

তিতুরাম চুপ করে রইল।

মামা ফিরল প্রায় আধঘণ্টা পর। যেন মল্লযুদ্ধ করে এসেছে। দাওয়ায় উবু হয়ে বসে বলল, তিতু, আর ঐ চামারের কাছে তোকে পড়তে যেতে হবে না। বাংলা সংস্কৃতটা কিছু শিখে নিয়েছিস তো, এখন থেকে কালীর কাছে বাকীটা শিখে নিস। কালী অর্থাৎ কালীপদ মুখোপাধ্যায়—তিতুরামের রগুড়ে পণ্ডিত মেজমামা।

মামা আরও বলল, পণ্ডিতটার দিন দিন লোভ যেন মাথায় উঠে যাচ্ছিল। গামছা কাপড়গুলো নেয় আর হাটে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। সাধে কি আর একটা গামছা ওকে দিই নি।

তিতুরামের ইচ্ছে হয়েছিল মামাকে জিজ্ঞাসা করে, তা কি করে এলে মামা পণ্ডিতের সঙ্গে? মারপিট করে এলে?

মামা না বললেও ব্যাপারটা আর গোপন থাকে নি। তিতুরাম ঠিক শুনতে পেয়েছিল। রাখহরি মুখোপাধ্যায় দ্রুত চলতে চলতে বাঁশ থেকে একগাছা সরু কঞ্চি ভেঙে নিয়েছিল।

পণ্ডিত তখন ছেলেদের এক এক করে পড়া জিজ্ঞাসা করে বিদায় করছেন। হঠাৎ মামাকে দ্রুত বেগে আসতে দেখে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি পড়া জিজ্ঞাসা করতে করতেই উঠে দাঁড়ালেন।

মামা পাঠশালায় ঢুকে কোন ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করল, আমার বোনপোকে তুমি মেরেছ কেন পণ্ডিত ?

পণ্ডিতের মুখে তখন কথা নেই। চুপ করে আছে দেখে মামা আরও রেগে গেল। তারপর কি যে হল কেউ জানে না। শুধু ছাত্ররা দেখল, দুজনে মাটিতে শুয়ে ধস্তাধস্তি করছে। আর মামা বলছে, রামপদ, তুই ছেলেবেলা থেকে আমার পিছনে লেগে আছিস। কতদিন বলেছি না আমার পিছনে লাগিস না। কেন আমার বোনপোকে মেরেছিস বল্। ও তোর কি করেছিল। ও তো পড়া তোকে ঠিকই দিয়েছিল।

পণ্ডিত তখন মামার নিচে শুয়ে আছে। হঠাৎ দেখা গেল, মামা পণ্ডিতের নিচে পড়ে গেল। পণ্ডিত মামার বুকের ওপর উঠে বসে বলতে লাগল, কি রে রেখো, আর আমার সঙ্গে লাগতে আসবি ? মনে নেই, সেই ছোটবেলায় তোর মুখে একটা ঘুসি ঝেড়েছিলাম।

এই রকম ধস্তাধস্তি কিছুক্ষণ চলবার পর মামা হঠাৎ পণ্ডিতকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঠিক আছে, আর তোর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ রইল না। আজ থেকে সব খতম।

সেই থেকে তিতুরামের পড়াও শেষ হয়ে গেল।

মেজ মামা যা শেখায় তা সব সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা। ওসব ভাল লাগে না। বরং ছোট মামার সঙ্গে কাকের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়ায় আনন্দ বেশী।

ছোট মামা সুযোগ পেলেই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। আর তিতুরামকে সঙ্গে নিয়ে যায়।

ছোট মামার চোখ দুটো সর্বদাই দুষ্টুমিতে ভরা। একবার একটা দারুণ অসম্ভব কাণ্ড করল। রায়েদের খড়ের গাদা দেখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তিতু একটা দেশলাই নিয়ে আয়তো ?

তিতুরাম তখনও কিছু বুঝতে পারে নি, ছুটে চলে গেল দেশলাই আনতে। আর দেশলাই নিয়ে আসতেই ফস করে কাঠি জেবলে ছোট মামা রায়দের খড়ের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে আগুন জবলতে লাগল।

সে যে কি আগুন তিতুরাম জীবনে ভুলবে না। রোদ পেয়ে শুকিয়ে খড়গুলি যেন ক্ষুধার্ত হয়েছিল।

রায়েদের বাড়ি পাশেই। রায়রা ছুটে আসবার আগেই ছোট মামা তিতুর হাত ধরে টানল। চ পালাই তিতু, এখন যদি এখানে থাকি ঠিক ধরা পড়ে যাব।

তিতুরামের চোখে জল এসে পড়েছিল। ও ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। যদিও

ছোট মামার দুষ্টুমিতে সে সাহায্য করে থাকে কিন্তু পরের ক্ষতিতে তার মন বেদনায় ভরে গেল।

সে ছোট মামার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ওদের খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিলে কেন? ওদের তো কত ক্ষতি হল?

ছোট মামা বলল, বেশ করেছি। তা ওদের খড়ের দাম দিতে হবে নাকি? জানিস ওরা কত বড়লোক!

তবু ছোট মামাকে তিতুরামের ছাড়তে ইচ্ছে করে না। ওর বাইরেটা যতই শান্তশিষ্ট হোক, ভেতরটা যেন ছোট মামার মতই দুষ্টুমি করতে চায়। তবু ছোট মামা ভাল, মেজ মামার ঐ সংস্কৃত শ্লোক কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। আর না ঢুকলেই মেজ মামা কালীপদ মুখোপাধ্যায় মাথায় ঠকাস করে গাঁট্টা কষিয়ে দেয়।

এত রাগ হয় তখন তিতুরামের। মাকে গিয়ে বলে, মা আমি মেজ মামার কাছে পড়ব না।

কেন রে!

মেজ মামা পড়া না পারলেই এমন মাথায় ঠকাস করে গাট্টা মারে!

মার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, আর যখন বড় মামা সন্দেশ, রসগোল্লা এনে খাওয়ায়, কই তখন তো বলিস্ না মা আর খাব না!

তিতুরাম তখন ষোলোয় পড়েছে। ছোট মামা কুড়ি। তখন ওদের খেলার ধারা একটু পালটে গেছে। আর ওরা কোকিলের ডিমও চুরি করে না বা কারও খড়ের গাদায় আগুন দেয় না। বরং ওরা তখন যৌবনের দোসর খুঁজে বেড়াচ্ছে।

গ্রামের অধিকাংশ মেয়েদের আট ন বছরের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যায়। কেউ শ্বশুর বাড়ি চলে গেল তো গেল। নয়ত যুবতী হবার আগে পর্যন্ত বাপের বাড়িতে থেকে গেল। আর যাকে কুলরক্ষার জন্যে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল সে তো চিরকালের জন্যেই বাপের বাড়িতে থেকে গেছে। এমনি একটি মেয়ে স্বর্ণ-মঞ্জুরীর সঙ্গে ছোট মামার ভাব।

ও পুকুরে স্নান করতে এলেই ছোট মামা তার সঙ্গে এসে দেখা করবে। তিতুরামের ষোল হলেও তখন থেকে মেয়েদের দেখে তার মুখে লজ্জা জাগতে শুরু করেছে। ছোট মামা স্বর্ণ-মঞ্জুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তিতুরামকে সঙ্গে নেবে। আর তিতুরামের মুখের ওপর লজ্জার ছায়া জেগে উঠবে।

স্বর্ণ-মঞ্জুরী একটু লঘু চরিত্রের মেয়ে। গায়ের রংও যেমন স্বর্ণের মত, আর কথাবার্তা খুব হাসি খুশি চটপটে। তিতুরামের লজ্জা লজ্জা মুখ দেখলে সে হেসে গড়িয়ে পড়ে। ছোট মামার দিকে ফিরে বলে, ও গঙ্গা. (তিতুরামের ছোট মামার নাম গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়) তিতুরামের মুখে লজ্জার ছায়া কেন?

ছোট মামা মুখ ঘুরিয়ে তিতুরামের মুখ দেখেই তার মাথায় এক চাটি। কি রে তুই স্বর্ণর মত মেয়েছেলে না ব্যাটাছেলে!

তবু তিতুরাম মেয়েদের সঙ্গে ঠিক মিশতে পারে নি। যখন তার আঠারো হয়ে গেছে, রাঘবের কাণ্ড দেখার পরও সে মনকে গুটিয়ে নিয়ে বসে থেকেছে। বরং তার জন্মের জন্যে আহত হয়েছে। মার দিকে তাকিয়ে তার মনটা ব্যথায় ভরে গেছে।

যখন মনে হয়েছে কাজকর্ম কিছু একটা করা উচিৎ। মা বলল, যগু, তিতুটাকে সঙ্গে নে। যগু অর্থাৎ যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়, তিতুরামের সেজ মামা। চাষ আবাদ করে, ধান, চাল বিক্রি করে। দরকার হলে হাটে যায়। খাতা লিখে কোন আড়ৎ থেকে অর্থ উপার্জন করে। নানা রকম কাজ করে আর কি।

সেজ মামা বলল, আমার এ কাজ পারবে কেন? অনেক ঝক্কি ঝামেলা এর মধ্যে আছে।

মা বলল, শিখিয়ে নে না। তিতুর বয়স তো কম হল না।

সেজমামা আর সে সময় কিছু উত্তর দিল না কিন্তু বড় মামা রাধহরি মুখোপাধ্যায় শুনে বলল, গিরি আমার ব্যবসায় তিতুরামকে লাগিয়ে দে। বয়সও কম আছে। আর এখন নতুন নতুন বিয়ে করে বেশ দু'পয়সা ঘরে আনতে পারবে।

মা চুপ করে রইল।

কিন্তু তিতুরামের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। সে মা ও মনোরমার কাহিনী জানে। তাছাড়া কুল-রক্ষার জন্যে কচি কচি মেয়েগুলোর বলি চোখের সামনে দেখছে। সেই বিয়ের ব্যবসা করে সে পয়সা উপায় করবে? মনের মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে সে কোন দিকে জল গড়ায় দেখতে লাগল।

বড় মামা আর একদিন কথাটা মার কাছে উত্থাপন করল।

মা বলল, তোমরা যেটা ভাল হয় কর।

বড় মামা তিতুরামের দিকে ফিরে বলল, কি রে রাজি তো। বল্ তাহলে তালিম দিতে শুরু করি।

তিতুরামের মধ্যে তখন কৌতুহল জাগছে। বিয়েটা কি? কেমন করে মামা বিয়ে করে? অবশ্য তিতুরাম যে নিজেদের গ্রামে অমনি দু' পাঁচটা বিয়ে দেখেনি তা নয়। বিয়ে দেখেছে। বিয়ে বিয়ে ব্যবসাও দেখেছে। কুল-রক্ষার জন্যে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে এলোকেশীর যখন বিয়ে হল তখন তো সে সেখানে দাঁড়িয়ে।

বিয়ে পর্ব চুকে যাবার পরে হারাধন জামাইবাবাকে অনুরোধ করল, অনেক কষ্ট তো আপনি আমার জন্যে করলেন, এবার রাতটুকু বিশ্রাম করে নিন, তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যাবে।

আশী বছরের জামাইবাবা আষাঢ় বাঁড়ুজ্যে ফোকলা দাঁতে ফক্ ফক্ করে হঠাৎ রুখে উঠে বলল, রাতটুকু যে বিশ্রাম করব তার জন্যে ব্যবস্থা করেছ!

ব্যবস্থা!

কেন ন্যাকা, জানো না। যা দিয়েছ তার জন্যে তো কুলরক্ষা করেছি। রাতে থাকতে গেলে যা আমার পাওনা সেটাও তো দিতে হবে।

হারাধন জোড়হাত করে বলল, আমার দেবার ক্ষমতা নেই বলেই তো আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

এলোকেশী তখন বধূ সাজে সেজে কপালে চন্দন, চোখে কাজল নিয়ে বাঁশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখ দুটি যে জলে টলমল করছে সেটা তিতুরামের চোখ এড়াল না।

কিন্তু জামাইবাবা পাওনা পেল না বলে সেই জলভরা চোখদুটির দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। সেই রাত্রিতে অন্যত্র চলে গেল।

তবু তিতুরামের কৌতুহল, বিয়ে বিয়ে ব্যবসার মধ্যে আসল কি আছে? শুধুই কি টাকা উপায়ের ফন্দী। আর কিছু নেই? তিতুরামের তখন যা বয়স এই কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক।

মামাকে বলল, তুমি আমায় তালিম দাও। আমি তোমার ব্যবসাই করব। মা শুনে চমকে উঠল, তিতু, তুই কুলরক্ষার ব্যবসা করতে যাবি? তার চেয়ে যগুর সঙ্গে ক্ষেতে যা না।

তিতুরাম বলল, না মা, আমি বড় মামার সঙ্গে কুলরক্ষার ব্যবসা করতে যাব।

ওতে লাভ বেশি। দেখছ বড় মামা কত টাকা, সোনাদানা জমিয়েছে। আর অন্য মামারা কি বড় মামার মত কিছু করতে পেরেছে?

মার মুখখানা যে কালো হয়ে গেল সেটা তিতুরাম লক্ষ্য করেও করল না। সারাজীবন মা এই কুলরক্ষা করেই স্বামী-সহবাসে বঞ্চিত হল সে কথা ভাবার মত সময় তখন তিতুরামের ছিল না।

গাছটার পাতার মধ্যে একটা ঝটাপট শব্দ হল। কি যেন গরম গরম মাথার পাতলা চুলের ওপর এসে পড়ল। তিতুরাম মাথায় হাত দিতেই বুঝতে পারল, পক্ষীকুলের কেউ মলত্যাগ করেছে। হাতের আঙুলগুলো সেই মলে মাখামাখি হয়ে গেল। কি করবে তিতুরাম ভেবে পেল না। ব্রাহ্মণের ছেলে। মল যারই হোক হাত অশুচি হয়ে গেছে। না ধুলে হাত নোংরা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ঘাসের ওপর হাতটা মুছে নিল। মলের দাগটি গেল কিন্তু চটচটে ভাবটা গেল না।

আর এখানে বিশ্রাম না নিয়ে এগিয়ে চলাই ভাল। কুচুণ্ডিয়া গ্রামে ঢুকলেই দুটো বড় পুকুর আছে। তিতুরাম সেই ভেবে এগিয়ে চলল।

এই যে গ্রামের পর গ্রাম ব্যবসার খাতিরে ঘোরা, শুরু তো সেই দিন থেকে। বড় মামা তিতুরামের ব্যবসায় ইচ্ছা দেখে খুব খুশি হয়ে উঠেছিল।

এক সপ্তাহ এক নাগাড়ে তালিম দিয়েছিল। নানারকম বিয়ে ব্যবসার ফন্দী-ফিকির। কি করলে কি হবে? মামা বলেছিল, তিতুরামের বয়স কম, খবরদার যেন কোন সজল চোখের দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে যায়। তাহলে আর ব্যবসা করা চলবে না। রাখহরি মুখোপাধ্যায় অবশ্য এসব ব্যাপারে খুব কড়া। কেউ তাকে দৃষ্টির ফাঁদে ফেলতে পারে নি। যদি ফেলত কতগুলি মামী যে ঘরে আসত সে তিতুরাম জানে না।

তোমার উদ্দেশ্য থাকবে মেয়েটির কুলরক্ষা করা। বিয়ের যা ব্যবস্থা তা ওরাই করবে। ওদের কোন আয়োজনের দিকে দৃষ্টি না দিলেই হলো। সে সানাই বাজিয়ে সামিয়ানা টাঙিয়ে বিরাট ভোজ দিয়ে দিক কিম্বা অল্প খরচের ব্যবস্থা করুক, তোমার পাওনা গণ্ডাটা পেলেই হল।

তোমার পাওনার যদি এতটুকু নড়চড় হয় তাহলে তুমি উঠে দাঁড়াবে। এসব ব্যাপারে একটু কড়া না হলে ব্যবসা তোমার একেবারেই চলবে না।

তিতুরামের বেশ মনে আছে, প্রথম বিয়ে করতে গিয়ে হেমার চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর আঠারো বছর তিনমাস বয়স। হেমার এগারো বছর সাত মাস। শুভদৃষ্টির সময় এমন চোখ তুলে তাকাল, যে দুটো চোখ ওর কাজল দৃষ্টির মধ্যে

আটকা পড়ে গেল। আর এমন ডেঁপো মেয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসির রেখা টেনে আরও কাহিল করে দিল।

মামা ব্যাপারটা লক্ষ্য করল, লক্ষ্য করেই এক ধমক, তিতু!

তিতুরাম তাড়াতাড়ি হেমার চোখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। এ যে ব্যবসা সে কথা মনে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামার স্বর্ণমঞ্জরীর কথা মনে পড়ল, ও গঙ্গা, তিতুরামের মুখে লজ্জার ছায়া কেন?

কিন্তু ঐ আঠারো বছর বয়েসেই হেমার জন্যে কাতর হয়ে উঠল তিতুরাম। ও একটু গুম হয়ে রইল। কিন্তু মামার ইচ্ছে ছিল, বিয়ের পর বাসর বসিয়ে দিয়েই তিতুরামকে নিয়ে কেটে পড়বে। সে কথা রাখহরি মামা বিয়ে করতে আসবার সময়ই বলেছিল।

তিতু, আমি যা করব তাই তুই মেনে নিবি। খবরদার মন নরম করবি না, করলেই ব্যবসা খতম। এ তো নরম মনের ব্যবসা। মেয়েগুলোর মুখ দেখলে মনটা এমনিই নরম হয়ে যায়।

তা তিতুরামের সেই প্রথম বিয়েতেই হেমার জন্যে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম বিয়ের প্রথম কনে কিন্তু হেমাঙ্গিনীকে সত্যিই দেখতে ভাল ছিল। বার বছরের রূপবতী কন্যা। সবে যৌবনের কুঁড়িটি ফুটছে। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ। বড় বড় কাজল টানা চোখ তুলে যখন তিতুরামের দিকে তাকাল, মামা ধমক দিল। নয়ত কতক্ষণ যে তিতুরাম তাকিয়ে থাকত জানে না।

বাসরে সবে যুবতী মেয়েটি হারমোনিয়াম বাজিয়ে একটা গান শেষ করেছে, মামা এসে ডাকলেন, তিতুরাম, অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়্।

তিতুরাম সেই সময়ে বেঁকে দাঁড়াল, মামা তুমি যাও, আমি যাব না।

রাখহরি মুখোপাধ্যায়ের পাশে এসে মেয়ের বাবা শিবনাথ দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, থাক না, ছেলেমানুষ গান বাজনা শুনছে।

মামা বলল, ভেবেছেন কি? মতলব করে জামাই আটকে রাখতে চান।

শিবনাথ বলল, না না, মতলব করে রাখব কেন? কথাই তো আছে, মেয়ে ঋতুমতী হলে জামাইবাবাকে নিয়ম মত খবর দিয়ে আনাব।

তবে?

কিন্তু সে রাত্রে মামা কিছুতেই তিতুরামকে নিয়ে যেতে পারল না। কথা থাকল, ভোর হলেই চলে যাবে। সারারাত ধরে গান বাজনা চলল। অনুরোধে তিতুরামও গান গাইল। তিতুরাম স্বর্ণমঞ্জরীর অনেকবার গাওয়া সেই কীর্তনটা গাইল।

'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা পেয়ে বার্তা তাই ডাকি তোমারে।
এ ভবের কড়ি নাইকো যার তুমি তারেই করো পার।
আমি দীন ভিখারী ওহে হরি তাই ডাকি তোমারে।'

বাসরের মেয়েরা তো হেসে খুন। এ কি গান! এ গান বাসর ঘরে কেউ গায় নাকি? তিতুরাম বোকার মত সধবা, বিধবা, কুমারী নানা বয়সী মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর রাত একটু গভীর হলে কেউ কেউ চলে গেল, আবার যারা রইল তারা সেইখানেই ঘুমে ঢলে পড়ল। হেমাঙ্গিনী ঘোমটার মধ্যে মুখ ঢেকে বসেছিল। ঘুমাচ্ছে কি জেগে আছে বোঝা যায় নি, হঠাৎ তিতুরাম চমকে উঠল নিজের হাঁটুর দিকে তাকিয়ে। হেমাঙ্গিনী তার সরু সরু আঙ্গুল দিয়ে তিতুরামকে চিমটি কাটছে।

তিতুরাম বলল, চিমটি কাটছ কেন?

হেমাঙ্গিনী বলল, তুমি চলে যেতে চেয়েছিলে কেন?

কে বললে? না তো!

বাহ্ আমি তো শুনলুম তুমি চলে যেতে চেয়েছিলে।

না, না, মামাই আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলো।

কেন?

সে কথা আর তিতুরাম মুখ ফুটে বলেনি। হেমাঙ্গিনী তার কোলের ওপর শুয়ে পড়েছিল। ওর মাথায় আর ঘোমটা ছিল না। খোঁপা বেঁধেছে জরির ফিতে দিয়ে। চোখে কাজল। কপালে চন্দন। সীমন্তে চওড়া করে সিঁদুর। তিতুরাম মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রং করা পাতলা ঠোঁট দুটিতে হাসি টেনে হেমা বলল, কি দেখছ অমন করে?

কিছু না।

এই বলো? বৌয়ের কাছে মিথ্যে কথা বলতে নেই। হেমাঙ্গিনী উঠে বসল।

বৌয়ের কাছে মিথ্যে কথা বললে কি হয়?

পাপ হয়। তুমি দেখছি কিছুই জান না। চলো আমি বাড়ি যাই, কি কি শিখতে হবে শিখিয়ে দেব।

তিতুরামের মুখ ম্লান হয়ে গেল। হেমা যে জানে না তাকে নিয়ে যাওয়া হবে না সেটা ভেবে দুঃখিত হল।

কি ভাবছ?

তোমায় যে নিয়ে যাওয়া হবে না সেটা বুঝি জান না?

হেমাঙ্গিনী হঠাৎ একটা দারুণ কাণ্ড করল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ওর কান্নার শব্দে চ্যাটাইয়ের ওপর শুয়ে থাকা মেয়েগুলো অবাক চোখে উঠে বসল।

তিতুরাম অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। অথচ এ তো সত্যি কথা, পরদিন প্রভাতেই এটা প্রমাণ হয়ে যাবে। আজই যেত। তিতুরাম জোর করে থেকে গিয়েছিল বলে মামা নিয়ে যেতে পারে নি। আর এটা ব্যবসা। তিতুরাম তো সত্যি করে বিয়ে করতে আসে নি। ব্যবসার খাতিরে প্রথম হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এখন হেমাঙ্গিনী কাঁদছে, তাকে কি করে চুপ করায়?

হেমা চুপ কর, কাল তোমায় নিয়ে যাব।

পরক্ষণে হেমাঙ্গিনীর চোখের জল বন্ধ হয়ে গেল। চোখ মুছে হেসে বলল, দেখলে তো আমার জিত।

ও হরি, তুমি জেতবার জন্যে এমনি কান্না শুরু করেছিলে? তবু তিতুরামের মনটা হেমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল। ওর সেই আঠারো বছর মাত্র বয়েস। সবে বিয়ে হয়েছে। দৈহিক সম্পর্ক ঘটুক না ঘটুক, হৃদয়ের মধ্যে একটা আবেগের জোয়ার তো আছে।

তাই পরদিন মামা এসে তিতুরামকে তাড়া দিলে তিতুরাম বলল, মামা আমি হেমাকে নিয়ে যাব।

হেমার বাবা শিবনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

মামা তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ব্যাপার কি? এক রাতেই বশ করে নিয়েছেন?

শিবনাথ বলল, না না, আমি কিছু করি নি। আপনার ভাগনেকে জিজ্ঞাসা করুন।

কিন্তু মামা তিতুরামকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। গজগজ করতে লাগল। শিবনাথের সঙ্গে মেয়ের মাসোহারার ব্যবস্থা করে ভাগনে ও ভাগনেবৌকে নিয়ে রওনা হল।

কিন্তু বাড়ি গিয়ে বোনের সামনে ফেটে পড়ল। গিরি, তোর ছেলের কান্ড দেখ্।

মা তখন বৌ দেখে একেবারে আহ্লাদে আটখানা। হেমাঙ্গিনী শাশুড়ীর পায়ে গড় করে প্রণাম করতেই মা বৌকে জড়িয়ে ধরল। মামার দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে দাদা? অমন বাংলা পাঁচের মত মুখ করে দাওয়ায় বসে পড়লে কেন?

মামা আর কোন কথা বলল না, শুধু তিতুরামের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। এদিকে মার আর হেমার মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। দেখা গেল, হেমা সংসারের সব কাজ জানে। শাশুড়ীকে বসিয়ে সে নিজেই দৌড়ঝাঁপ করে কাজ করতে লাগল।

মা যেন মেয়েদের এই চিরন্তন আপন স্বভাবে খুশি হয়ে উঠল। তার জীবন এই ভায়েদের বাড়িতে কেটেছে। তার কি ইচ্ছে ছিল এমনিভাবে চিরকাল ভায়ের বাড়িতে থেকে স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে? কিন্তু কুলরক্ষার যে ঐ হুজুগ। মেয়েদের কথা কে কবে শুনেছে? মেয়েরাও যে মানুষ এ কথাটা তো কেউ জানতেও চায় না।

তাই মার যে মনে ইচ্ছে ছিল হেমা এখানে থাকুক তিতুরাম সেটা বুঝতে পেরেছিল। জোরটা তার মার জন্যেই এসেছিল।

কিন্তু মামা আড়াল পেলেই তিতুরামের কানে আবার মন্ত্র দিতে লাগল। মেয়েটা নয় কদিন এখানে থাক, চ না আর একটা বিয়ে দিয়ে আসি।

তিতুরাম হুঁ হাঁ না কোন কিছুই উত্তর না দিয়ে মামার সামনে থেকে সরে পড়ে।

আর ওদিকে হেমা ঐ ডেঁপো ফাজিল মেয়েটা আর একটা আব্দারে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে।

ওর ইচ্ছে দুজনে রাত্রিবেলা এক সঙ্গে শোয়। কিন্তু মা সে ব্যবস্থা হতে দেয় নি, পুত্রবধূকে নিজের কাছে নিয়ে শোয়।

ছোট মামা গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায় এসব ব্যাপারে একটু পটু। সে জানায়, দূর, বিয়ে করা বউ আবার অন্য জায়গায় শোবে কি? এই যে স্বর্ণ অন্য লোকের বউ…।

তিতুরাম এ সব কথা শোনে আর মনে মনে উপায় ভাবে। হেমাকে বলে, তুমি কোন উপায় ভাব না।

হেমা বলে, তুমি পুরুষ-মানুষ হয়ে কিছু ভাবতে পার না, আমি কি ভাবব?

এদিকে তো শখ আছে ষোলআনা। তুমি ঋতুমতী হলে তো দু' বাড়ি থেকে শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।

হেমার মুখে লজ্জার ছোপ পড়ে। ও যে এসব জেনে ফেলেছে, তিতুরামের বুঝতে অসুবিধা হয় না। হেমা দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে বলে, আমি তো সেই জন্যে শুতে চাই নি, কেন যেন রাত্রিবেলা তোমাকে ছাড়া শুতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু হঠাৎ ক'দিনের মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

মামা এ দিকে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, ব্যবসাটা এইভাবে থেমে যাবে সে ভেবে পায় নি। তার বয়েস হয়েছে, আগের মত আর আমদানি হয় না। সে জায়গায় তিতুরামকে দিয়ে কিছু উপায় করে নেবে এই মতলবে ছিল। অবশ্য তিতুরাম স্বীকার করে, মামা না থাকলে হেমার বাবার কাছ থেকে ভিজিটটা অত পাওয়া যেত না। ভিজিট শব্দটা চালু হয়েছিল কুলীন অধিপতিদের মুখ থেকে। অবশ্য ডাক্তারের মত ভিজিট নেওয়াই একে বলা হবে। কুমারী মেয়েদের কুলরক্ষা করলেই দায় মুক্ত।

মামা একদিন তিতুরামকে ডেকে আর একটা বিয়ের কথা বলছিল। কখন হেমাঙ্গিনী মামাকে মিছরির সরবৎ দিতে এসেছে কেউ খেয়াল করে নি। হঠাৎ তিতুরাম লক্ষ্য করল, হেমার হাসিখুশি মুখখানি মুহূর্তে পাংশু হয়ে গেল। ও কিছু বলবার আগেই হেমা মামার হাত থেকে শূন্য গেলাস নিয়ে ছুটে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে মা ভেতর বাড়ি থেকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, তিতু শিগ্‌গীর এদিকে আয়, বৌমা এখুনি বাপের বাড়িতে চলে যেতে চাইছে।

মামা নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, যাক্ বাবা বাঁচা গেল। ও নিজেই যখন যেতে চাইছে তখন বাধা দিস না। মামা যে খুব খুশি হল, তিতুরাম দেখেই বুঝতে পারল।

কিন্তু তবু তিতুরাম ঘরে গিয়ে হেমার হাত চেপে ধরেছিল। এই ক'মাস হেমা এসেছে, ও যে তিতুরামের বৌ সে কথা তিতুরাম ভুলে গেছে। বরং মনে হয়েছে আবাল্য একটি সাথী। ও না থাকলে তিতুরামের আহার নিদ্রা ভালভাবে হবে না।

তিতুরাম হাত চেপে ধরতে হেমা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখের জল লুকোল।

কি হল, তুমি চলে যাচ্ছ কেন ?

চলে যাব না তো কি এখানে বসে বসে অনাদর নেব ?

কে তোমায় অনাদর করেছে ? মা তোমায় খুব ভালবাসে।

মার ভালবাসায় থাকছি নাকি ?

তিতুরাম মনে মনে একটু নিজেকে তৈরী করল। আমি কি তোমায় ভালবাসি না ?

বাসলে আবার বিয়ে করতে যেতে !

তিতুরামের খুব রাগ হয়ে গেল। এত অহংকার তো ভাল নয়। যখন ব্রাহ্মণদের ঘরে দু'পাঁচটা বিয়ে সবাই করছে সে জায়গায় হেমা ভেবেছে কি ? ওকে নিয়ে তিতুরাম সারাজীবন থাকবে নাকি ? কিন্তু হেমার মনের অবস্থা তখন তিতুরামের বোঝার ইচ্ছে হয় নি। রাগ করে বলল, তুমি কি আমাকে এক বউ নিয়ে সুখী থাকতে বলো নাকি ?

হেমা চলে গেল বাপের বাড়ি। তিতুরামই অবশ্য হেমাকে পেঁছে দিয়ে এসেছিল। শিবনাথ মেয়েকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল, শিবনাথ বলল, মাসোহারা পেঁছতে দেরি হয়েছে বলেই কি এই নির্বাসন ?

তিতুরাম জবাব দেয় নি।

তিতুরাম ফিরে এল বটে কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। শূন্য বাড়িতে ওর আর মন টিঁকতে চাইল না। বার বার হেমার কথাটা মনে পড়ে। ডুরে কাপড় পরা ঘোমটা দেওয়া একটি ছোট্ট বউ। নাকে নোলক, পায়ে তোড়া, ড্যাবডেবে চোখে কেবল তিতুর দিকে তাকায়। ওর চোখে কেবল শাসনের ভঙ্গি। ও যে তিতুর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট এটা যেন মেয়েটা ভুলে গেছে।

তিতুরাম ঐ মেয়ের কাণ্ড কারখানা দেখে বুঝেছিল, ওরা একদিকে যতই অবহেলিতা হোক তারা পুরুষকে বশ করার অনেক মন্ত্র জানে।

তিতুরামেব মুখ শুকনো, খাওয়া দাওয়া কমে যাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখে মা কথাটা মামার কানে তুলল। মামা শুনে বলল, ও কিছু নয়। আর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করছি, সেই দেখলে আর মন খারাপ থাকবে না। বয়স কম তো।

বয়স কমের কথা ভেবে তিতুরামও মনে মনে একটু স্থির হবার চেষ্টা করল। চোখের সামনে তো দেখছে রাখহরি মামার দৃষ্টান্ত। কই মামা তো কোন মামীর জন্যে এতটুকু উতলা হয় না। অথচ সে তো মামার খাতা খুলে দেখেছে মামা এর মধ্যে একাত্তরটা বিয়ে করে ফেলেছে। সারা বছর সেই শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আসা করে। আবার নতুন বিয়ের খোঁজ পেলেও লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গিয়ে সেই বিয়েতে বসে যায়।

কিন্তু তবু তিতুরামের মন হেমার কথা ভুলতে পারল না। হেমা যেন স্বপ্নে তার সামনে এসে উদয় হয়। হেমা যেন তার বড় বড় চোখ তুলে শাসায়, তুমি যদি তোমার মামার মত গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে কর, তাহলে তোমার মনে কোনদিনও শান্তি আসবে না।

কিন্তু মামার ব্যবসায়ী বুদ্ধিটা চুপ করে থাকল না। আবার একদিন হন্তদন্ত হয়ে একটা বিয়ের খোঁজ নিয়ে এল। বলল, তিতু, আজই বিয়ে। দেবে থোবে ভাল, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে।

তিতুরামের মনে কোন উৎসাহ ছিল না, সে চুপ করে রইল।

মামা তাড়া দিল, কই ওঠ্। ওদের কথা দিয়েছি। ওরা একটু অল্প বয়েসের পাত্রই খুঁজছে। তুই না করলে আবার অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিনোদগোপাল বসে পড়বে। শুধু কুলরক্ষা করে চলে আসবি। শিবনাথের বাড়ির মত কোন অসুবিধায় পড়বি না। মেয়েটা একটু বড়। বয়েস হয়েছে অথচ এখুনি বিয়ে না দিলে আর মর্যাদা থাকবে না। শুধু কৌলিন্য প্রথা বজায় রেখে চলে আসবি।

মা এসব বিয়েতে কোনদিনও রাজী নয়। শুনে বলল, থাক না দাদা. শুধু কতকগুলো মেয়ের মাথা খেয়ে লাভ কি?

মামা বলল, মেয়ের মাথা খাওয়া মানে?

মা সপ্রতিভ হয়ে বলল, এই তো আমার অবস্থা দেখছ। সারাজীবন ভায়ের বাড়িতে আমায় পড়ে থাকতে হচ্ছে।

মামা সে সব কথায় কান না দিয়ে বলল, যখনকার যা। এখন যখন এমনি করে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে কুলরক্ষা হচ্ছে তখন আমরাই বা সে সুযোগ নেব না কেন? গিরি, তোকে কি আমরা কোন অনাদর করেছি?

মা ম্লান হেসে বলল, অনাদর কেন? তবু তো এ বাপের বাড়ি। মেয়েদের বিয়ে হলে কি মেয়েরা বাপের বাড়িতে থাকতে চায়?

মামা এ কথায় মাকে কোথায় সমবেদনা জানাবে, সে রেগে গেল। বলল, বুঝেছি বুঝেছি শিবনাথের ঐ ডেঁপো মেয়েটি এসে তোদের দুজনের মাথাটা খারাপ করে দিয়ে গেছে। সেদিন শিবনাথকে কষে ধমক দিয়ে দিয়েছি।

মা জিজ্ঞাসা করল, ওমা হেমার বাবাকে আবার কোথায় পেলে?

মামা বলল, তাকে কি পাওয়ার অসুবিধে? সেও তো দেখলুম এই ব্যবসা ধরেছে। কোথায় যেন কাদের সেরেস্তায় কাজ করত, কি ঝামেলায় কাজ চলে যেতে এই ব্যবস করে দু' পয়সা কামাচ্ছে। হাঃ হাঃ হাঃ...

মামা এমন জোরে হেসে উঠলো যেন সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠলো।

তিতুরাম কুচুণ্ডিয়া গ্রামে পেঁাছে গেল। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল এখানেই তো শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। ওর মেয়েটার নামটা যেন কি? নামগুলো কিছুতেই তিতুরামের মনে থাকে না।

খাতা খুলতে হয়, পর পর নামগুলো দেখতে দেখতে তারপর বিশেষ নামটি চোখে পড়ে।

তিতুরাম এইভাবে নামগুলো সাজিয়েছে। প্রথমে গ্রামের নাম। তারপর বাপের নাম। শেষে মেয়ের নাম। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ের নাম সোনামণি। কুড়ি বছর আগে বিয়ে হয়। সাতমাস আগে তিতুরামকে আনতে লোক গিয়েছিল, কারণ ছেলের বিয়ে, বাপের আসার দরকার। তা তিতুরাম শ্বশুরবাড়ি এমনি গিয়ে হাজির হয় না। জামাই আদর ঠিকমত হবে জেনে তবে যায়।

আর একটু এগোলেই শ্রীনাথের বাড়ি কিন্তু ওখানে আজ যাবে না তিতুরাম। আজ তার অন্যত্র কাজ আছে। সেখানে প্রাপ্তিযোগটাও ভাল হবে। এই বিয়ে-ব্যবসা করে তো কম টাকা পয়সা জমল না।

দুটো পুকুরই পাশাপাশি। দুটোর জলই পরিষ্কার। কে একটি বউ কাপড় জামা খুলে সায়াটা বুকে তুলে পুকুরে ডুব দিচ্ছিল। তিতুরাম একটু থমকে দাঁড়াল। ঐ বউটির সামনে যাওয়ার ইচ্ছে তার নয়। হয়ত ঐ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাত বৌ, যার বিয়েতে তিতুরামকে যেতে হয়েছিল। অবশ্য বলতে গেলে তারও পুত্রবধূ বলা যায়। এ কথা ভেবে তিতুরাম একটু হাসল। বিয়ে ব্যবসায় এই একটা উপকার হয়েছে, কোন ঝক্কি ঝামেলা পোয়াতে হয় না। যদি পোয়াতে হত তাহলে তার ঘরে বৌ আর ছেলে মেয়েতে হাট বসে যেত। ঐ তো শ্রীনাথের মেয়ে সোনামণি সেদিন বলল, এটি তোমার ঔরসজাত সন্তান।

অবশ্য এটা তিতুরাম ঠিক হলফ করে বলতে পারে না। সোনামণির সঙ্গে কোনদিন রাত্রিবাস করেছিল কিনা ঠিক তার মনে নেই। ওর বাবা শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় কি তিতুরামকে রাত্রিবাসের জন্যে যোগ্য প্রাপ্য দিয়েছিল?

সোনামণি বলল, হ্যাঁ, তুমি দুদিন আমাদের বাড়িতে ছিলে।

তাই শুনে তিতুরাম হেসে উঠল।

সোনামণি বলল, হাসলে কেন?

তিতুরাম বলল, এমনি।

সোনামণি বলল, কি তোমার অবিশ্বাস হয়, ছিলে না বলছ?

তিতুরাম বলল, বেশ বাবা ছিলুমে। না থেকেছি তো হয়েছে কি? না থাকলেও তো কিছু এসে যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে তিতুরামের মনে পড়ে গেল নিজের জন্মের কথা। রাত্রিবাস করতে গেলে মেয়ের বাপের যে টাকা থাকার দরকার। তা না থাকলে আর কি করা যাবে? তাই বলে কি মেয়ে সন্তান-সম্ভবা হবে না? না কেউ আটকে রাখতে পারবে?

তিতুরাম তাড়াতাড়ি পাশের পুকুরে নেমে হাতটা ধুয়ে নিল। দ্রুতই এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। যদি গোপাল দেখতে পায় তাহলে ঠিক ধরে নিয়ে যাবে। আর তখন এমন একটা মুস্কিলে পড়ে যেতে হবে।

ঔরসজাত সন্তানের কথায় দ্বিতীয় বিয়েটা তিতুরামের মনে পড়ে গেল।

হেমার কথা ভুলতে পারছে না, অথচ মামাও জেদ ধরেছে এই বিয়েটা কর।

মা কোনক্রমেই এ বিয়েতে বাধা দিতে পারল না। মামা ঝাঁঝিয়ে উঠল, ভেবেছিস্ কি? সারা জীবন ভায়ের বাড়িতে পড়ে আছিস্। ছেলে একটু সুখের মুখ দেখাবে এটা বুঝি তুই চাস্ না?

তিতুরাম দেখেছিল মায়ের মুখে সেই নারীত্বের অবমাননা। সেও তো সমাজের কাছ থেকে কম লাঞ্ছনা পেল না। গড়গড়ি গাঙ্গুলী সেই যে কুলরক্ষা করে গেছে আর এ মুখো হয় নি। তিতুরাম একবার মামার সঙ্গে পরামর্শ করে বাবাকে আনতে চেয়েছিল কিন্তু মা রাজী হয় নি। মায়ের মুখে দেখেছে কি কঠিন সংকল্প। অথচ মায়ের দৃষ্টিতে বেদনার ছায়া।

তাই দ্বিতীয় বিয়েটাও তিতুরাম করতে চায় নি কিন্তু মামা কানে কানে যে সব পাওনার লোভ দেখাল তিতুরাম আর না করল না।

আর সত্যি গিয়ে দেখল, পাওনার ওজনটা মন্দ নয়। বিয়ে হয়ে গেল। শুভদৃষ্টির সময় কন্যার মুখ দেখে তিতুরাম কেমন যেন রোমাঞ্চ অনুভব করল।

কমলার বয়স শুনেছিল বেশি কিন্তু এত বেশি তিতুরাম ভাবতে পারেনি। হেমা সে জায়গায় যেন বালিকা।

মামা ওর মনের অবস্থা দেখে বলল, চেপে যা না। তোর ব্যবসা নিয়ে কথা, ব্যবসা হয়ে গেলেই চলে যাবি।

কিন্তু চেপে যেতে বললেই তো আর চেপে যাওয়া যায় না। কমলার ভারী বুকের দিকে চেয়ে ঐ উনিশ বছরের ছেলে কয়েকটা ঢোক গিলল।

বাসরঘর যথারীতি হল। বাসর ঘরে পাশাপাশি বসতেই গ্রামের একটি ছেলে এসে তিতুরামের সামনে দাঁড়াল।

ওর লক্ষ্য গেল, কমলা যেন ঘোমটা একটু ফাঁক করে ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে।

তিতুরামের রাগ ধরে গেল। ব্যবসা যাই হোক সে তো এখন কমলার স্বামী। রাত যদি কাটাতে হয় এর সঙ্গেই কাটাবে। আর রাত কাটাতে হবে বলেই তো মামা যেন বলেছিল। মেয়েটার চেহারা বেশ বাড়ন্ত। বয়স বলেছিল, তেরো। কিন্তু তেরো যে নয় তিতুরাম বেশ বুঝতে পারছিল। যাই হোক প্রথম জীবনে নারী সঙ্গ। তিতুরাম বেশ একটু লুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ কানে গেল বাইরে একটা প্রচন্ড গোলমাল শুরু হয়েছে। আর তারই মধ্যে

মামার গলাই সোচ্চার। মামা যেন কাকে বলছে, জোচ্চর, পাজী, ছুঁচো, লজ্জা করে না আবার কথা বলছ!

কমলার বাবা শম্ভুচন্দ্রের গলাও শোনা গেল, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন মামাবাবু। ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা একটু শুনুন। যা শুনেছেন তা ভুল।

মামার উত্তর, আমি যা শুনেছি তা ভুল আর আপনি যা বলবেন তা সত্যি! যা রটে তার সবটাই কি মিথ্যে? বেশ আপনার মেয়েকে ডেকে আনুন।

বাসর ঘরের হাসি মস্করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবার কান ঐ বাইরের দিকে। সেই ছেলেটিও এই গোলমালের মধ্যে কখন সরে পড়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল নতুন বৌ কমলা উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে।

কে যেন বলল, ও কমলা তুমি আবার কোথায় চললে?

কমলা কারুর কথার জবাব দিল না, শুধু বক্তার দিকে এক ঝলক ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চলে গেল। তিতুরামের লক্ষ্য গেল, কমলার চন্দনচর্চিত উজ্জ্বল মুখখানির ওপর থেকে কে যেন সব রক্ত শুষে নিয়েছে।

হঠাৎ মামা ঘরে ঢুকল, তিতুরামকে বলল, আয় উঠে আয়। আর যদি কখনও এ বাড়ি মুখো হবি তাহলে তোর সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ছেদ হয়ে যাবে।

মামা আর তিতুরামকে ভাবতে দিল না, হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে বোঁচকা বুঁচকি সঙ্গে নিয়ে একেবারে পথে। তিতুরাম ব্যাপারটার রহস্য কিছুই বুঝল না। এইটুকু বুঝল, কমলার বাবা ঘোরতর অন্যায় করেছে, মামা সেইজন্যে ক্ষিপ্ত। কিন্তু ওর মনে কমলার জন্যে খুব দুঃখ হলো। রাতটা কমলার সঙ্গে কাটালে কি হত; উনিশ বছরের যুবক তখন তিতুরাম, এটা ভাবাও খুব অন্যায় নয়।

সারা পথ মামা কিছু বলল না। বাড়ি যেতেই মা জিজ্ঞাসা করল, একি তোমরা যে চলে এলে? তিতুরামের শ্বশুর বাড়িতে থাকবার কথা ছিল না!

মামা বলল, আর বলো না, ঐ শম্ভুচন্দ্রটা যে এমন জোচ্চর একটুও ভাবি নি। মেয়েটাকে দু'মাস অন্তঃসত্ত্বা করে তারপর লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছে।

তিতুরাম তখন মনে মনে ভাবছে, তাহলে বাসর ঘরে ঐ ছেলেটিই কি সেই? আর কমলা উঠে গেল বোধহয় ঐ জন্যে। ওর চোখের ওপর সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়িতে সে আর কোনদিনও ভুলেও যাবে না।

মা বলল, তিতু চিত্রশালী থেকে লোক এসে অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। তিতুরাম চমকে উঠল। চিত্রশালী গ্রামে হেমা থাকে। তবে কি হেমার কোন বিপদ হল? অমঙ্গলের ভয়ে তিতুরাম একটু মুষড়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে মা চিত্রশালীতে?

মা বলল, কিছু হয় নি। যা না বাইরের ঘরেই তো বসে আছে।

হেমার দাদা গিরিশচন্দ্র বসেছিল। তিতুরাম যেতে, উঠে দাঁড়াল। বলল, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাবা পাঠিয়েছে। একটা চিঠি দিল। সেই চিঠিতে

লেখা ছিল, হেমা পূর্ণনারীরূপ পেয়েছে। অর্থাৎ সে ঋতুমতী হয়েছে। তোমার উপযুক্ত খরচ দেব, পার তো গিরিশের সঙ্গে চলে এস।

কমলার সাহচর্য ঘটে নি, তার ওপর হেমার আহ্বান। উনিশ বছরের ছেলে তিতুরামের মন নেচে উঠল। কিন্তু মামা শুনে বলল, কখনও নয়। তিতু তোকে আমি বলেছি না ব্যবসা করতে গেলে অত নরম মন হলে চলে না।

মা বলল, তুমি কি বলছ দাদা? একটা মেয়ের কথা ভেবেও তিতুকে সেখানে যেতে দেবে না?

মামা বলল, তুই মেয়েছেলে, তুই সব ব্যাপারে মাথা গলাস্ কেন? আমরা মামা ভাগনে যা পারি করব?

কিন্তু তিতুরাম মামাকে সায় দিতে পারল না। একে তার উঠতি বয়স। হেমা যুবতী হয়েছে। হেমা অভিমান করে চলে গিয়েছে। তিতুরাম সেই রাত্রেই গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে চিত্রশালী গেল। যখন গিয়ে পেঁছিল, রাতের এক প্রহর কেটে গেছে।

শিবচন্দ্র জামাইকে দেখে খুব খুশি হল। আহারাদির পর শয়নকক্ষে পেঁছিলে দেখা গেল, হেমা যেন অন্য মানুষ। সেই বার বছর কোথা দিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে তিতুরাম তখনই জানল, মেয়েদের পরিবর্তন কত তাড়াতাড়ি হয়? কমলাকে দেখেছিল. আর এই হেমাকে দেখল। তফাৎ শুধু একজন তার জন্যে লালায়িত। আর একজন । কমলার কতখানি দোষ অবশ্য তিতুরাম জানে না।

হঠাৎ হেমা বলল, কি, একেবারে বোবা হয়ে গেলে নাকি?

তিতুরাম বলল, তোমাকে দেখছি। তুমি এত সাজগোজ করেছ। কপালে চন্দন। খাটেও দেখছি ফুলশয্যা হয়েছে। আজ আমাদের ফুলশয্যা নাকি?

হেমাঙ্গিনী স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, জানো না, মেয়েদের তো এইদিনেই সত্যিকারের বিয়ে!

আর আগেরটা কি ছিল?

বাহ্ সেটাও বিয়ে। তবে সেটা অনুষ্ঠান ছিল, এটাই সত্যিকারের বিয়ে। এই বলে হেমাঙ্গিনী তিতুরামের কানে কানে একটা গোপনীয় কথা বললো।

তিতুরাম একটু চুপ করে রইল। হঠাৎ তিতুরাম বলল, ধর, আমি যদি আজ না আসতাম?

হেমাঙ্গিনী সঙ্গে সঙ্গে বলল, ইস্ না এলে কি হত? আমি কি তোমার জন্যে মরে যেতাম?

তিতুরামের মনে ছিল কমলার কাণ্ডটা। বলল, জানি জানি আমি না এলে তুমি অন্যলোকের সন্তানের মা হতে।

আমায় কি সেইরকম মনে হয়? হেমা এত রেগে গেল যে ঘরের দরজা খুলে চলে যেতে চাইল।

তিতুরাম তাড়াতাড়ি বউয়ের হাত ধরে ফেলল। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। কমলার আর হেমার তফাৎ কতখানি! কিন্তু ওর তখন উনিশ বছর বয়স। মেয়েদের সম্বন্ধে তখনও কোন জ্ঞান হয় নি।

হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ? হঠাৎ বলল, তুমি আর বিয়ে করতে যাও নি তো! তোমার বড় মামাটা কিন্তু মানুষ খুব ভাল নয়।

তিতুরাম বলল, তুমি গুরুজনদের নামে দুর্নাম করছ। কুলীনরা কিন্তু দশ পঁচিশটা বিয়ে করছে।

ভাল লোক কখনও এ কাজ করে না।

তিতুরাম বলল, আমি কিন্তু আজই একটা বিয়ে করে এসেছি

হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টি হঠাৎ তিতুরামের মুখের ওপর অনেকক্ষণ থেমে রইল। তিতুরাম দেখল, হেমাঙ্গিনীর মুখের ওপর তার দুঃখিনী মায়ের প্রতিচ্ছবি। অনেক পরে বলল, সত্যি!

তিতুরাম বলল, সত্যি!

হঠাৎ হেমাঙ্গিনী চিৎকার করে উঠল, তুমি আমার কোন কথাই শুনলে না। কোনো প্রার্থনাই রাখলে না। এতই উত্তেজিত হয়ে উঠল যে বাইরে থেকে হেমাঙ্গিনীর মা বলল, কি হয়েছে রে হেমা? জামাই ঘরে রয়েছে অত জোরে চেঁচাচ্ছিস কেন?

কিন্তু হেমা সেই উত্তেজিত অবস্থাতেই তিতুরামকে ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিল। দু'চোখ দিয়ে তখন তার শ্রাবণের ধারা বইছে। তিতুরামের খুব কষ্ট হল কিন্তু রাগও হল হেমার কাণ্ড দেখে। অত অহংকার তো ভাল নয়!

শিবনাথ বলল, তুমি যেও না তিতুরাম। আমি হেমাকে বোঝাচ্ছি, জানো তো ও পাগলী মেয়ে।

সত্যিই কি হেমা পাগলী ছিল? তিতুরাম সে কথা বয়েস হলে অনেক বারই বোঝবার চেষ্টা করেছে।

বাবা!

তিতুরাম হঠাৎ পিছন দিকে না তাকিয়ে দৌড়তে লাগল। নির্ঘাৎ গোপাল দেখে ফেলেছে। গোপাল দেখে ফেললে আর রক্ষে নেই। তাহলে ঠিক সোনামণির কাছে ধরে নিয়ে যাবে। সাতমাস আগে দেখেছে সোনামণির তখন অবস্থা ভাল হয়েছে। ছেলের বিয়েতে তিতুরামকে নিয়ে গিয়ে অনেক কিছু দানপত্তর করেছিল। এটা একেবারে ভাবে নি তিতুরাম। কুড়ি বছর আগে যখন শ্রীনাথের দু' মেয়ের কুলরক্ষা এক সঙ্গে করেছিল, তখন শ্রীনাথের অবস্থা ভাল ছিল না।

লোকে বলে তিতুরামের একটু দয়ার প্রাণ। তা অবশ্য কথাটা খারাপ বলে নি। অন্য লোকেরা যেভাবে কসাইয়ের মত মেয়ের বাবার কাছ থেকে দুয়ে নেয়, তিতুরাম সেটা পারে না। তার অবশ্য দুটো কারণও আছে, এক মা মরার সময়ে তিতুরামের

হাত ধরে মা চোখের জলে বলেছিল, বাবা তিতু আমার ইচ্ছে ছিল না তুই কুলরক্ষার ব্যবসা করিস। কিন্তু যখন ছাড়লি না, তখন তোকে একটা অনুরোধ করি, তুই মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকাস। মা না বললেও কি জানি কেন তিতুরামের মেয়েগুলোর ওপর একটা আন্তরিকতা জেগে উঠেছিল। ও অবস্থা খারাপ বাপের মেয়ে দেখেও বিয়েতে বসে যেত।

শ্রীনাথ কেমন করে যেন এ ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল। তিতুরামের হাত ধরে মিনতি করেছিল। এমন কি তার চোখে জলও দেখেছিল তিতুরাম।

দুটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে শ্রীনাথের। তখনই বেশ ডাগর ডোগর হয়ে উঠেছিল, সোনামণি আর রূপোমণি। একরাত্রে এক পিঁড়িতেই দু'জনের বিয়ে। অবশ্য রাত্রিবাসের কোন প্রশ্ন আসেনি। অর্থ আনুকুল্য যখন নেই তখন এ ইচ্ছা কে প্রকাশ করবে?

সোনামণি বড় ও রূপোমণি ছোট। সোনামণি বেনারসী পরে কপালে চন্দন দিয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বরের পুঁটলী বাঁধা দেখছিল

হঠাৎ রূপোমণি সেখানে এল। ওরা দু' বছরের ছোট বড়। কিন্তু সোনামণি যত গম্ভীর, রূপোমণি ঠিক তার উল্টো

হঠাৎ বলল, দিদি, আমাদের বাসর হবে না।

না।

কেন?

সোনামণি বলল, বাবার টাকা নেই বলে।

রূপোমণি এর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক কি বুঝতে পারল না

সোনামণি বোনের দিকে বেদনাভরা দৃষ্টিতে তাকাল। দুই বোনেরই এক সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। শ্রীনাথ যা জুটিয়েছে দু' মেয়েকে ভাগ করে দিয়েছে। বড় মেয়ে বরং খারাপ কাপড় পরেছে কিন্তু ছোটকে ভাল কাপড় দিয়েছে। নারী জীবনের একই কামনা। তবু সোনামণি যেটা বোঝে, রূপোমণি সেটা বোঝে না। বাসর হবে না কেন এ কথা যাকে জিজ্ঞেস করছে তারও তো প্রশ্ন একই।

তিতুরাম তখন শ্রীনাথের কাছ থেকে পাওয়া যৎকিঞ্চিৎ পুঁটলির মধ্যে ঢোকাচ্ছে। যৎকিঞ্চিৎ বলতে একেবারে নমো নমো নয়। এর জন্যে অবশ্য শ্রীনাথ শেষসম্বল জমিটুকু বিক্রী করেছে।

সেই তিতুরামের কাছে রূপোমণি চলে এল। ও বর, তুমি পুঁটলি করে এসব নিয়ে চলে যাচ্ছ কেন? রাত্রিবেলা থাকবে না।

তিতুরাম রূপোমণির দিকে তাকাল। সোনামণি পাশে এসে বোনের হাত ধরল।

এই কি করছিস, চলু?

রূপোমণি হাত ছাড়িয়ে নিল। বোনের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, তোর সঙ্গে কথা বলেছি যে তুই এসে হাত ধরছিস। রূপোমণি আবার তিতুরামের দিকে তাকাল, বর, আমার কথার জবাব দাও নি কিন্তু।

তিতুরাম কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না। সবটাই কি ব্যবসার মধ্যে চলে? আর এ ব্যবসা তো যে সে ব্যবসা নয়। কুলরক্ষার ব্যবসা কচি কচি মেয়েগুলোর সরল প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। তিতুরাম জবাব দিল। কেন, তুমি কি থাকতে বলছ?

থাকতে বলছি কি না বুঝতে পারছ না। রুপোমণি ঝঙ্কার দিয়ে কথাটা শেষ করল।

দূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীনাথ। তার মুখে কোন কথা নেই। বোধহয় সে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারছে না। প্রথমত সে বাপ হয়ে অক্ষম। দ্বিতীয়ত রুপোমণি যে মন নিয়ে জেদ করছে সে তো কিছু অন্যায় করছে না। বিবাহিত জীবনে সব মেয়ে' চায় স্বামীসান্নিধ্য।

তিতুরাম বলল, আমি থাকলে তুমি খুশি হবে?

এবার রুপোমণির সরল মুখখানির ওপর লজ্জার ছায়া ফুটে উঠল। ও আর কথা বলতে পারল না। মুখ নিচু করল।

তিতুরাম রাত্রিবাসের খরচ শ্রীনাথের কাছে পায় নি বটে কিন্তু সে রাতে একটি মেয়ের মুখে যে খুশির জোয়ার দেখেছিল, তা সে জীবনে ভুলবে না।

রুপোমণি সারা রাত তার বরকে নিজের মনোমত করে সাজিয়েছিল, গান গেয়েছিল বরের কোলে শুয়ে।

তিতুরামের ঘুম এলে জিজ্ঞাসা করেছিল, ও বর, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? লক্ষ্মীটি তুম ঘুমিও না। তুমি তো আর কোনদিন আসবে না। আজ তুমি আমার ইচ্ছেতে থেকেছ বলে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি খুব ভাল। তোমার মত লোক হয় না। তুমি কুলরক্ষা করে চলে যাও নি বলে আমার খুব ভাল লাগছে।

হঠাৎ রুপোমণি নিচু হয়ে তিতুরামের পা দুটি অনেকক্ষণ নিজের মুখ দিয়ে চেপে রেখেছিল। হঠাৎ পায়ে গরম জলের স্পর্শ পেয়ে তিতুরাম জিজ্ঞাসা করেছিল, এ কি তুমি কাঁদছ নাকি রুপো?

রুপোমণি হঠাৎ মুখ তুলে হেসে উঠেছিল। চোখের জল মুছে বলেছিল, কাঁদি নি তো। বড় আনন্দ হচ্ছে তো। তাই চোখে জল আসছে। জানো, আমাদের গ্রামের কেউই বরকে নিয়ে রাত্রিবাস করতে পারে নি।

কেন?

আমাদের গ্রামের লোক যে খুব গরীব।

সেই রুপোমণি বছর তিনেক পরে মারা গেল। খবরটা পেয়ে তিতুরামের দেখতে যাওয়ার কথা নয়। ভিজিট না দিলে কোন জামাই শ্বশুবাড়ি যায় না। সে বউ মরুক, আর বৌয়ের বাবা মরুক। তিতুরামও যায় না, কিন্তু রুপোমণি মরবার পর গিয়েছিল। আর মনে পড়েছিল সেই রাত্রের কথা।

তাই সোনামণির অবস্থা ভাল হতে সে ঘুরে ঘুরে তার বিষয় সম্পত্তি দেখেছিল।

সোনামণি বলেছিল, তুমি এখানে থেকে যাও না। কি সারাজীবন ঘুরে ঘুরে মরবে? বয়স তো হচ্ছে!

তা তিতুরামের বয়স হলেও ওর কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল কোন স্ত্রীর বাড়িতেই একদিনের বেশী নয়। ভিজিট দিলেও নয়। তাতে নাকি আদর কমে যায়। আর যখন ব্যবসাই এটা তিতুরামের, তখন কেন ব্যবসার আসল স্বরূপ নষ্ট করবে?

কিন্তু ঐ বিয়ে বাড়িতেই সোনামণি তিতুরামকে নিয়ে দরজা বন্ধ করেছিল।

তিতুরামের মুখ গম্ভীর! এ কি হঠাৎ আমায় নিয়ে দরজা বন্ধ করলে কেন?

সোনামণি শরীর থেকে কাপড়টা একটু আলগা করে দিয়ে হেসে বলেছিল, তোমার ভিজিটটা দিলেই তো হল। আজ আমার অনেক টাকা। একদিন তোমার ভিজিট দিতে পারি নি বলে তো তোমায় পাই নি।

তিতুরাম বলেছিল, তোমার ছেলের যে বিয়ে! গোপাল কি মনে করবে?

গোপাল কিছু মনে করবে না সে মায়ের দুঃখু বোঝে।

তিতুরাম সেই সব ভেবে কোনদিকে না তাকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কে যেন তাকে ধরে ফেলল। আর ধরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বগল থেকে খাতাসুদ্ধ পুঁটলী, মাথা থেকে গামছাখানা মাটিতে পড়ে গেল।

জোয়ান লোকটা তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে দিয়ে জোড়হাত করে বলল, বাবা, তুমি আমাকে দেখে ছুটছিলে কেন? আমাকে চিনতে পারছ না?

তিতুরাম তখন খাতাসুদ্ধ পুঁটুলি ও গামছাখানার ধুলো ঝাড়ছে। গোপাল নয় বলে নিশ্চিন্ত। কিন্তু এ কে? একে তো তিতুরাম ঠিক চিনতে পারছে না। পিছনে অনেক দূরে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল।

লোকটি সেই দিকে তাকিয়ে একবার বলল, তুমি আমায় চিনতে পারলে না!

তিতুরাম গম্ভীর হয়ে মেজাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে মনে বলল, চিনতে যখন পারি নি তখন সরে পড় না বাপু, আমি আমার পথে চলি।

কিন্তু লোকটি যে সহজে ছাড়বে না তাও বোঝা গেল। তিতুরাম যে তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাবে তাও হবার নয়। ওর শক্তির কাছে তিতুরামের শক্তি কিছু নয়। কালো মোটা চেহারা। লোমশ বুক। হাত-পাগুলো বেশ পুরুষ্ট। দর দর করে ওর চওড়া লোমশ বুক বেয়ে ঘাম ঝরছে। ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই। কাঁধে পাট করা একটা গামছা।

লোকটি বলল, আমাকে দেখে একদম চিনতে পারলে না বাবা। আমি নীলু।

নীলু নামটা তিতুরাম কয়েকবার উচ্চারণ করল। তারপর মাথা ঝাঁকাল। চিনতে পারা যাচ্ছে না।

নীলুর তখন মুখের অবস্থা ভাল নয়। দূরে আর একবার বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকা গরুর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে তারপর ঢোক গিলে বলল, তোমার নাম তো তিতুরাম গাঙ্গুলী।

তিতুরাম মাথা ঝাঁকাল। ঐ নামই তো সবাই বলে আমায়।

হঠাৎ নীলু নিচু হয়ে তিতুরামের পা দু'টি ছুঁয়ে প্রণাম করল। তিতুরাম কর কি, কর কি, বলারও সুযোগ পেল না, কাজটি হয়ে গেল। অগত্যা তিতুরামকেও পৈতে ছুঁয়ে ভক্ত নীলু নামীকে আশীর্বাদ করতে হল।

নীলু তখন সেই গরুর গাড়ির উদ্দেশ্যে দৌড় লাগিয়েছে। তিতুরাম একটু চিন্তিত। যাক বাবা একটা প্রণামের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেল। গামছাখানা, একেবারে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে। আর একটু এগিয়ে গেলে দত্তদের পুকুর, ওখান থেকে গামছাখানা কেচে নিলে হবে। আজকের রোদের তাতটাও বেশি। সূর্যের দিকে তাকিয়ে তিতুরাম তাতটা পরখ করল। এখনও অনেক পথ যেতে হবে। সন্ধ্যার আগে পেঁছিলেই হবে। অবশ্য আগে পেঁছিলে একটু বিশ্রাম নেওয়া যেত। সে কি আর হবার যো আছে? পথে ঘাটে নানান বাধা।

ফিরবে বলে মনে করছে, হঠাৎ ওর লক্ষ্য গেল, গরুর গাড়ি থেকে একজন নারী নামছে। অবশ্য হাত ধরে নামাল নীলু। ওরা দুজন এগিয়ে আসছে। তিতুরাম ওদের চলার গতি দেখে একটু বিমর্ষ হয়ে গেল! আজ তার গন্তব্য স্থানে যাওয়ার দফা রফা। এইজন্যেই কুচুণ্ডিয়া গ্রামে ঢোকার পর থেকে সে এত ভয়ে ছিল। আগেও একবার এই পথ দিয়ে যাবার সময় সে বিপদে পড়েছিল।

সে কথা এখন আর ভাববার সময় পেল না তিতুরাম। কাছে এসে গেল দুজনে।

স্ত্রীলোকটি মনে হয় কোন ঠাকুরতলা থেকে আসছে। লাল পাড় শাড়ি পরণে। স্বাস্থ্যটিও মোটামুটি হৃষ্টপুষ্ট। কপালে তামার পয়সার মত সিঁদুরের টিপ, চওড়া সিঁথি। সিঁথিতে সিঁদুরের প্রলেপ। ভড়ং দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটি কোন কুলরক্ষার বলি নয়। স্বামী সোহাগিনী ও স্বামী গর্বে গর্বিতা।

হঠাৎ সামনে এসে গলায় আঁচলটা জড়িয়ে সেই রাস্তার ওপর হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল। প্রণাম করলে তাকে আশীর্বাদ করাই রীতি। তিতুরামও পৈতে বের করে আশীর্বাদ করল। বিড় বিড় করে কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ চেপে গেল।

তখন সেই ভক্ত নারী বলছে, চিনতে পেরেছ তো!

তিতুরাম নিরুত্তর।

নারী তখন নীলুর দিকে ফিরে বলল, দেখ্‌লি, আমি বললুম উনি আমাকে দেখেই চিনতে পারবেন।

উনি? তিতুরামের মনে একটু খটকা লাগল। তবে কি এও তার কোন বউ নাকি?

নীলু তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখখানির অবস্থা ভাল নয়। খানিকটা রাগের ঝাঁঝও মুখের ওপর ছড়িয়ে আছে। সে বলল, বাবা তো আমাকে দেখে চিনতেই পারল না!

তখন সেই স্ত্রীলোকটি বলল, সে কি গো, নীলুকে তুমি চিনতে পারলে না? সেইযে গো ছোট বেলায় কোলে তুলে কত নাচাতে। তখন অবশ্য খুব ভারী ছিল।

তখন ভারী ছিল, এখন কি খুব হালকা? তিতুরাম মাথা ঝাঁকাল, না সে চিনতে পারে নি।

স্ত্রীলোকটি বলল, একেবারে ভুলে গেছো? এই যে দু'বছর আগে সেই গেলে। নীলু তোমায় তার ধানের গোলা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি দুদিন অসুখ করে আমাদের বাড়িতে পড়েছিলে।

এই সময়ে নীলু বিরক্ত হয়ে বলল, মা, বাবা যখন চিনতে পারছে না, তখন কি দরকার চেনা দেওয়ার।

মা ধমক দিল। তুই থামতো, মানুষটাকে তুই চিনিস বেশী না আমি চিনি! এত বিয়ে করলে কি কারোর বউয়ের কথা মনে থাকে?

তিতুরামের দিকে ফিরে বলল, সদুকে তোমার মনে নেই গো? বৈতলের দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে সৌদামিনী।

এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরা পড়তে তিতুরামের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বৈতল যেতে গেলে এ পথ দিয়েই যেতে হয়। এখান থেকে বৈতল সাত আট ক্রোশ পথ। তা এরা কোথায় গিয়েছিল?

তিতুরাম সে কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যে মুখ তুলতে সদু একটু লজ্জিত হয়ে বলল, তুমি হয়তো জানো না আমার একটি মেয়ে হয়েছে, সেই মেয়ের বড় অসুখ। হঠাৎ সৌদামিনী নীলুর দিকে তাকিয়ে বলল, নে বাবাকে নিয়ে আয়, আমি এগোই, মেয়েটা এক ছইয়ের মধ্যে রয়েছে।

সদু এগোচ্ছে। হঠাৎ তিতুরাম তাড়াতাড়ি বলল, না না সদু, আজ আমি যেতে পারব না। আজ আমার অনেক কাজ।

সৌদামিনী চোখ পাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। কাজ যে তোমার আছে সে কি আমি জানি না। তুমি কি আর এমনি টো টো করে ঘুরে বেড়াও? সেই যে গেলে আর তো এমুখো হলে না। চিঠি পাঠালুম, লোক গেল, তবু সাড়াটি দিলে না। এই অভাগী তোমার কাছে কি দোষ করেছিল বলতে পার? না বাবা বিয়ের সময়ে তোমায় একটাও পয়সা দেয় নি!

সৌদামিনী আবার কথা ঘুরিয়ে নীলুকে বলল, বাবাকে নিয়ে আয়।

প্রতিবাদ করা গেল না। আর প্রতিবাদ করলেও যে সদু শুনতো না তিতুরাম সেটা জানে। অগত্যা নীলুর পিছন পিছন গরুর গাড়ির দিকে এগোল।

ছইয়ের মধ্যে বসে সদুর বকর বকর শুনতে শুনতে তিতুরামের মনে পড়ছিল সদুর বিয়ের কথা।

দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ওর মামার মতই বহু বিবাহের ব্যবসা করত। তবে মামার

মত কপর্দকহীন নয়। কিছু জমিজমা ছিল, বেশ সচ্ছল অবস্থা। আর ঘরে ছিল একটি নিজের জাতের বউ। দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা সত্যম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটবেলায় বিয়ে দিয়েছিল। সেই বৌয়ের মেয়ে এই সৌদামিনী।

যখন ওর আট বছর বয়স। মামা রাখহরি এসে বলল, তিতু, তুই কিছু মনে করিস না। মেয়েটার বয়স একটু কম। ওর বাবা খুব ধরেছে, তোর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে।

তিতুরামের তখন বাজার বেশ গরম। আমদানী ভালই হচ্ছে! তাছাড়া সবাই তখন অল্প বয়সের বর খুঁজছে। মামার কথায় তাই তিতুরাম বলল, আমায় কেন? তুমিই তো রয়েছ, তুমি বিয়ে করে ফেল না।

মামা জিব কাটল। কি যে বলিস্? দিগম্বর যে আমার বন্ধু লোক। বন্ধুর মেয়েকে বিয়ে করে আমি জামাই হতে পারি?

সে কথাটা যে ঠিক নয় তিতুরাম সেটা জানত। মামা বন্ধুর মেয়ে বলে কখনই ছেড়ে দিত না। ঠিক সে বসে যেত। ওর যখন বিয়ের ব্যবসায় রমরমে অবস্থা, তখন মামা অনেক ভাঙচি দিতে শুরু করেছিল।

একবার তো হাতে নাতে ধরাও পড়ে গিয়েছিল। মেয়ের বাবা তিতুরামকে খুঁজেছিল, মামা বলে দিয়েছে সে এখানে নেই। পথে সেই মেয়ের বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল।

তখন থেকেই তিতুরাম জেনেছিল, মামা আর চায় না তার ভাগনে এই ব্যবসায় জাঁকিয়ে বসুক।

যাই হোক সদুকে বিয়ের কথা মামাই বলেছিল। এবং তিতুরামকে মামার কথা মতই বিয়ে করতে যেতে হয়েছিল।

দিগম্বর খরচ-পত্তর ভালই দিয়েছিল।

ঐ যে কিছুক্ষণ আগে সদু গর্ব করে বলল, আমার বাবা কি বিয়ের সময়ে একটাও পয়সা খরচ করে নি, সেটা ঠিক না। দিগম্বর সদুর বিয়েতে যে খরচ করেছিল, এরকম ব্যয়বহুল বিয়ে তিতুরাম একটিও করেনি।

কিন্তু কনে দেখে তিতুরামের হাত-পা ছেড়ে যাবার দাখিল। শুভদৃষ্টির সময়ে আট বছরের কনে এমন প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে রইল, ত্রিশ বছরের যুবক তিতুরামের কান্না পেয়ে গেল। কনে যেন খেলার পুতুল পেল। চোখ বড় বড় করে বলল, অ তুমি বুঝি বলু।

বলু! তিতুরাম তখন চোখে অন্ধকার দেখছে। তাহলে আট বছরের খুকির এখনও জিবের আড় ভাঙে নি!

তিতুরাম অবশ্য তখন এই আট বছরের অনেক মেয়ের কুলরক্ষা করেছে। আট থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্তই তো সীমা রেখা ছিল। এর বেশি বয়স হলেই অভিভাবকরা গেল গেল বলে রব তুলতো।

কিন্তু এই সদুর মত খুকি মেয়ে সে তার জীবনে একটিও দেখে নি।

মামা পাশে দাঁড়িয়েছিল। চোখ টিপে ইশারা করল, অত ভাবনার কি দরকার?

হঠাৎ ঐ মেয়েই বাসর ঘরে সবাইকে বলল, তোমলো থবাই তলে যাও। আমি আর বলু এ ঘরে থাকব।

সেই সৌদামিনীর দিকে তিতুরাম তাকাল। আগে ছিল রোগা প্যাকাটি চেহারা, এখন বেশ মোটা ভারী হয়েছে। তা আর হবে না? বয়স তো সৌদামিনীরও কম হল না।

সৌদামিনী বলল, কি দূরে দূরে বসে আছ? সরে এসে বস না। সৌদামিনী তিতুরামের কনুই ধরে কাছে টেনে আনল।

টানাটানিতে তিতুরামের বগল থেকে পুঁটলিটা পড়ে গেল।

এটা কি? সৌদামিনী বলল।

তিতুরাম তাড়াতাড়ি বগলে পুঁটলীটা ঢুকিয়ে বলল, ও কিছু নয়।

কিছু না আবার কি? সৌদামিনীর দৃষ্টি স্বামীর ওপর।

বলছি কিছু না। তিতুরাম বিরক্ত। সৌদামিনীর মুখটা একটু ভারী হয়ে উঠল। একে ভারী চেহারা, তার ওপর ফর্সা মুখের ওপর দিনের আলো পড়েছে। অভিমানীকণ্ঠে বলল. এতদিন পরে দেখা, তুমি আমায় বকছ?

তাড়াতাড়ি তিতুরাম নিজেকে একটু সহজ করে নিল। না না, বকিনি তো! কি বলছিলে বলো।

তোমার ঐ পুঁটলীতে কি?

ওর মধ্যে একটা খাতা আছে।

খাতায় কি আছে?

তিতুরাম চুপ।

হঠাৎ সৌদামিনী বলল, ও বুঝেছি বুঝেছি, আমার সব সতীনদের নাম।

এই সময়ে পাশে শুয়ে থাকা মেয়েটি কেঁদে উঠল। সৌদামিনী তাড়াতাড় তাকে কোলে নিয়ে ভোলাতে লাগল। মেয়েটি চুপ করলে তিতুরামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও না, নিজের মেয়েকে তো একদিনও নিলে না।

তিতুরাম খুশি হল না। মেয়েটি দেখতে মন্দ নয়। মায়ের মত বেশ ফর্সা হয়েছে। চোখে রোগের চিহ্ন, না হলে বেশ ভালই দেখতে লাগছে। কিন্তু ঐ জন্যে তো তিতুরাম বিরক্ত হচ্ছিল না। তার মনে এক প্রশ্ন জাগছিল, এ কি তার ঔরসজাত সন্তান?

মেয়েটি তিতুরামের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। তাই দেখে সৌদামিনী উল্লাসে বলল, দেখো দেখো মেয়ে কিরকম বাপকে দেখছে।

তিতুরাম সদুর দিকে একটু তাকাল। কোন কথা বলল না। এইরকম করে তো তার বৌয়েরা দু পাঁচটা সন্তানের মা হচ্ছে। আর তাকে বাধ্য হয়ে সন্তানদের স্বীকৃতি দিতে হচ্ছে। তিতুরামের শুধু প্রশ্ন, এই সব সন্তানদের সে কি সত্যি

জনক ? দু'পাঁচজনের হয়ত হতে পারে কিন্তু সবার ? কিন্তু কিছু বলা যাবে না। আর বলতেও তিতুরাম চায় না। এ যে হবে এ তো জানা কথা। আঠার বছর বয়স থেকেই জানতে শিখেছিল।

সৌদামিনী বলল, এই লক্ষ্মীর জন্যেই জয়চণ্ডীপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে মা শেতলার পুজো দিয়ে এলাম। মেয়েটার পেটটা কিছুতে ধরছে না।

বলতে বলতে হঠাৎ সৌদামিনী থেমে গেল। ওদিকে তখন তিতুরামের মুখের রেখা পালটে গেছে। সৌদামিনী বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও আমি হাতটা ধুয়ে দিচ্ছি। ঘেন্না কি, নিজের সন্তান তো।

তিতুরাম আর একবার সদুর দিকে তাকাল। সৌদামিনী নীলুকে ডাকল।

নীলু গাড়োয়ানের কাছ থেকে নেমে এসে মাকে জল দিল। লক্ষ্মী ও তিতুরামের ধোয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল। আবার গাড়ি চলতে লাগল। তিতুরামের সৌদামিনীর সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এটা অবশ্য ঠিক কথা, টাকাপয়সা, কাপড়, চাল সবই সৌদামিনী দেবে কিন্তু এখানে তো আজ যাবার কথা নয়।

গোলমালটা করল ঐ শ্যামাচরণই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ শ্যামাচরণের বাড়িতেই প্রথম গিয়েছিল। অবশ্য এর পর কিছু বাড়িতে যাবার কথা আছে কিন্তু এইরকম পদে পদে বাধা এলে আর কি করা যাবে!

শ্যামাচরণের বাড়িতেও একটা হুজুগ লেগে গেল। শ্যামাচরণ তো গেল জামাইয়ের খরচ যোগাড়ে। এদিকে বাড়ির মেয়েরা জামাই সেবা নিয়ে পড়ল।

তিতুরাম বেশ আহ্লাদ নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল। ভেবেছিল প্রাপ্তি যোগটা ভালই হবে। শ্যামাচরণের অবস্থা ভাল। তিনবছর আগে যখন এ বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল, খরচপত্তরটা বেশ ভালই দিয়েছিল।

আর তাছাড়া মেয়ে ডাগর হয়েছে, ঋতুমতী হয়েছে, শ্যামাচরণ যখন রাত্রিবাসের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, তখন পাওনা গণ্ডা বেশ ভালই দেবে। কিন্তু যখন শ্যামাচরণ কাকুতি মিনতি করতে লাগল তখন রক্ত মাথায় উঠল!

যাইহোক ভিজিটের টাকা কমিয়ে যা রফা হল তাতেই তিতুরাম সন্তুষ্ট হল।

শ্যামাচরণ চলে গেল খরচ যোগাড়ে। তিতুরাম সন্তুষ্ট মনেই শ্বশুরবাড়িতে থেকে গেল।

গিয়েছিল সকালে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু গড়ানোর জন্যে শয্যা নিল। পায়ের কাছে একটি মেয়ে এসে বসল। আগে সারা সকাল ধরে এই মেয়েটিই একগলা ঘোমটা দিয়ে ঘুরছিল। ওর পা-ই দেখেছে তিতুরাম, আর কিছু দেখতে পায় নি। দুটি পায়ে দু' জোড়া রুপোর তোড়া। ঝুন ঝুন করে শুধু চলার ছন্দে বেজেই চলেছে।

ওর এসবে আজকাল আর রোমাঞ্চ জাগে না। তখন শুধু মাথার মধ্যে এক চিন্তা, শ্যামাচরণ খরচ যোগাড় করতে পারবে তো!

মেয়েটি পায়ের তলায় বসে পা টিপতে লাগল। তিতুরাম দেখল তার মাথায় ঘোমটা নেই। খুব কচি। নাকে একটি বড় সাইজের নোলক। নাকে, কানে, গলায় হাতে বেশ গয়না রয়েছে। পা টেপার দোলানীতে সেই গয়নাগুলি থেকে একটা ঝনাৎ ঝনাৎ মিষ্টি শব্দ উঠছে। তিতুরাম রেগে গেল, শ্যামাচরণের পয়সা নেই, জামাইকে খরচ দিতে পারছে না, কিন্তু মেয়ের গায়ে তো গয়নার বহর আছে!

তিতুরাম বলল, তোমার নাম কি? মেয়েটি একটু অবাক হল। অবাক হয়ে তিতুরামের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

তিতুরাম আবার জিজ্ঞাসা করল, তুমি বোবা নাকি?

মেয়েটি বলল, না, আমার নাম বিমলা।

তা কথা বলছিলে না কেন?

বিমলা চুপ করে রইল।

আমি তোমার কে হই জানো?

মেয়েটি লজ্জিত হল। মুখ নামিয়ে নিয়ে তিতুরামেরই ফাটা পায়ে হাত বুলোতে লাগল। ওর লজ্জা রাঙা মুখখানি দেখে তিতুরামের ভাল লাগল। মেয়েটি ঋতুমতী হয়েছে। ও হয়ত জেনে ফেলেছে নরনারীর মধ্যে সম্বন্ধ কি? এইরকম প্রথম স্বামী সহবাসে উন্মুখ মেয়ে তো তিতুরাম কম দেখে নি। আর তাদের খুশিও কম করে নি সে। কিন্তু তিতুরামের আসল উদ্দেশ্য ব্যবসার ঠাটটা বজায় রাখা। ব্যবসায় যদি লোকসান হয়ে যায়, মেয়েরা খুশি হলেও তিতুরাম খুশি হয় না।

এই যে বিমলা রাঙা মুখখানি নিয়ে মাটিতে চোখ নামিয়ে বসে আছে। ওর তো মুখের হাসি মনের আনন্দর সব দায়িত্ব ওর বাবার ওপর নির্ভর করছে।

যাইহোক তিতুরাম বিমলাকে কাছে টেনে নিল। মেয়েটি স্পর্শে একটু কেঁপে উঠল। তিতুরাম জিজ্ঞাসা করল, কি খারাপ লাগছে?

বিমলা মাথা নেড়ে চোখ নামিয়ে বলল, না।

আচ্ছা বিমলা তোমার বাবা যদি আমার রাত্রিবাসের খরচ না দেয় তাহলে তো আমি চলে যাব, তোমার এতে কষ্ট হবে না!

বিমলা একটু চকিতে তিতুরামের দিকে তাকাল। তারপর দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

কিন্তু ঘটনাটা ঘটল ঠিক তাই। সন্ধ্যে থেকে তিতুরাম দুর্ভাবনায় কাল কাটাচ্ছিল। এদিকে মেয়েকে সাজানোর বহরে তো কান পাতা যায় না। ঘন ঘন উলু। ছুটে ছুটে বৌ ঝিরা উঁকি মেরে ঘরের মধ্যে জামাইকে দেখছে।

রাত্রের খাওয়াও এক সময়ে শেষ হল। খেতে বসে তিতুরাম সামনে ঘোমটা ঢাকা এক বয়স্কাকে জিজ্ঞাসা করল, শ্বশুরমশাই এখনও কি ফেরে নি?

ঘোমটা ঢাকা একটু ঘোমটাটা তুলে ফিস ফিস করে বলল, না বলে গেছে একটু রাত হবে। ততক্ষণ তুমি বাবা ঘরে বিশ্রাম নাও। ঠিক সময়ে এসে পড়বে।

তিতুরাম আর কিছু বলল না, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা রাজসিকই ছিল। খেয়ে

উঠে সেই আগের ঘরের বিছানার ওপর শুয়ে কোমরের কাপড়টা খুলে দিল। উৎকর্ণ হয়ে রইল।

কিন্তু কিছু শোনা গেল না। রাতও ধীরে ধীরে বেড়ে চলল। হঠাৎ দরজার কাছে অনেক স্ত্রীলোকের কলস্বর শোনা গেল। বিমলাকেও দেখা গেল। সুন্দর সেজেছে। ঠিক বিয়ের কনে মনে হচ্ছে।

তিতুরামের কাছে এ তো আর নতুন নয়। বহু ঋতুমতী মেয়ে সে দেখেছে। আর তাদের সঙ্গে রাত্রিবাসও কম করে নি। কিন্তু শ্যামাচরণ এখনও আসছে না কেন? তবে কি শ্যামাচরণ এটা চালাকি করে সরে পড়েছে? আসলে কি জামাইকে ভিজিট দিতে চায় না? এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিতুরাম কোমরের কাপড় ঠিক করে স্প্রিং দেওয়া পুতুলের মত লাফিয়ে উঠে বসল।

আর তখনই সে শুনতে পেল কতকগুলি কথা।

দুজন বয়স্কা রমণী বেশ জোরেই কথাগুলি বলছে। মেয়ে তো ঋতুমতী হতেই একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলল।

এখন বাপ কোথায় গেল। বাপ যে চালাকি করছে, যদি জামাই এখন উঠে চলে যায় তাহলে মেয়ের পেটে যেটা এসেছে সেটা কোন্ ভাগাড়ে বিয়োবে!

আরো অনেক কথাই তিতুরামের কানে গেল কিন্তু সে সব কথায় সে কান দিল না! ব্যাপারটা খুব সুবিধের নয় তো! ঐ মেয়ে তাহলে একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে, আর তাকে সেইজন্যে ডেকে আনা হয়েছে?

সে আগেই উঠে বসেছিল। নিজের পুঁটুলিটা কোথায় রেখেছিল খুঁজতে লাগল। পেয়ে গেল বালিশেরই পাশে। এই সময়ে কারা যেন ঠেলে বিমলাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

তিতুরাম ছুটে গিয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু তার আগেই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। সব রাগ গিয়ে পড়ল সজ্জিতা মেয়েটির ওপর।

সে তখন তিতুরামের দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। আহা সেজেছে নতুন বিয়ের কনের মত। কপালে চন্দন, চোখে কাজল। কে যেন মাথায় গাদা গাদা সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। প্রদীপের আলোতেও দেখা যাচ্ছে চুল আর কালো নেই, লাল হয়ে গেছে।

নতুন বিয়েই বটে। কত বয়স হবে? তেরো কি চোদ্দ। মেয়েটি এর মধ্যে পেটে বাচ্চা এনে ফেলেছে। এমন ভাব করছে যেন কিছুই জানে না।

তিতুরাম অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, এ কাণ্ডটা করতে গেলে কেন?

মেয়েটি হঠাৎ পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল, আমার কোন দোষ নেই বলাই জোর করে…

বলাই কে?

বিমলা চুপ করে রইল।

তোমার বাবা তাহলে এই জন্যেই আমায় এত খাতির করে এনেছে !

আপনি শ্নলেন কেমন করে ?

তিত্রাম মেয়েটির স্পর্ধা দেখে তার দিকে তাকাল।

ঐ তো ওরাই বলছিল, যারা বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ বিমলা ঝটিতি উঠে দরজা খ্লে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, মানদাপিসি, তুমি আমার সর্বনাশ করে দিলে গো। দেখো, আমার বর কি সব বলছে ?

বিমলা দরজার সামনে বসে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল, ইত্যবসরে তিত্রাম প্ঁটলিটি বগলে চেপে হাওয়া।

কি ভাবছ এত ?

তিত্রাম সৌদামিনীর দিকে তাকাল।

মনে হচ্ছে, সকাল থেকে কিছ্ খাও নি ?

তিত্রাম চুপ করে রইল।

কোন্ শ্বশ্রবাড়ি থেকে ?

তিতুরামের ম্খের ওপর হাসি ফ্টে উঠল। একবার ভাবল বলে কাণ্ডটা কিন্তু কি ভেবে চুপ করে রইল।

সৌদামিনী একট্ চেঁচিয়ে বলল, বাবা নীল্, আর কত পথ ?

এই যে মা, আর একটা বাঁক। তারপর ঘোষালদের প্কুরটা পার হলেই আমাদের বাড়ি। অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

সৌদামিনী বলল, আমি ব্যস্ত হই নি রে। তোর বাবা সকাল থেকে কিচ্ছ্ খায় নি তো।

নীল্ বলল, বাবা তো আসতেই চায় নি। তুমি জোর করে আনলে বলে তো এল।

সৌদামিনী একট্ আড়চোখে স্বামীকে দেখে নিল, তারপর হেসে বলল, তোর কি মা একটা যে তোর বাবার ফ্রসৎ থাকবে ? মায়েদের কাছে যেতে যেতেই তো তোর বাবার সোমবৎসর সময় থাকে না।

আবার একট্ নিস্তব্ধতা।

গর্র গাড়িটা বোধহয় একটা গাড্ডায় পড়ে গিয়েছিল। সেটা তোলার জন্যে গাড়োয়ান ও নীল্ দ্জনে বিচিত্র শব্দ করতে লাগল। অ্যাই, অ্যাই হ্যাট চ্ উ উ উ । মঙ্গলা মঙ্গলা একট্ জোরে টান। (মঙ্গলা সম্ভবতঃ গর্র নাম) এক সময়ে গর্র গাড়িটা গাড্ডা থেকে উঠে পড়ল। আবার দ্লকি চালে চলতে লাগল।

নীল্ বলল, মা বাবাকে সেই কথাটা বলেছ ?

সৌদামিনী বলল, কোন্ কথাটা রে ?

বাহ্ তোমায় সেদিন বললাম না।

সৌদামিনী স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার গলা চড়াল, কোন্ কথাটা বলবি তো। আমার কি ছাই সব কথা মনে থাকে ?

হঠাৎ সোদামিনীর মনে পড়েছে এমনিভাবে বলল, তুই সেই গাইগরু দুটো কিনবি এই কথা তো !

নীলু ভেংচি কেটে বলল, হ্যাঁ বলেছে তোমায় সে কথা। ও সব কথা বাবাকে বলতে যাব কেন ?

তবে কোন্ কথাটা ?

আহ্ আমি যে তোমায় সেদিন বললাম না, বাবার মত অনেক বিয়ে করব !

সোদামিনী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, শুনেছ !

তিতুরাম চোখ বুজে বলল, হুঁ।

দাও এবার ছেলেকে ক'টা পাত্রী জুটিয়ে !

তিতুরাম কোন জবাব দিল না।

ক'দিন ধরে নীলু আবদার ধরেছে, তোমার মত বিয়ে করে বেড়াবে।

তিতুরাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, ওর বাপের মত ওরও কি অবস্থা হয়েছে ? বাপ নয় অন্য কোন কাজকর্ম না জোটাতে পেরে এই ব্যবসা ধরেছিল ওর নিশ্চয় সে অবস্থা নয়। সদু তোমার ছেলে যেন কি করে ?

সোদামিনী বলল, ওমা তুমি দেখছি সবই ভুলেই গেছ। বাবা যা রেখে গেছে সবই তো দেখাশুনা করে নীলু। নীলুর এইবার একটা বিয়ে দেব, কি বলো ?

হ্যাঁ, বিয়ে তো দেওয়া উচিত। কত যেন বয়েস হয়েছে ওর !

তা আঠারো তো পার হতে চলল।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল তিতুরামের। এই আঠারতেই তো সে প্রথম বিয়ে ব্যবসায় নেমেছিল।

কোথায় যেন ঘুঘু ডাকছিল। নিস্তব্ধ দুপুর। সোদামিনী পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওকে নড়ানো মুস্কিল। নড়ানো কেন, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় ও আর উঠবে না। তিতুরাম সোদামিনীর দিকে তাকাল। কাপড় টাপড় চাপা দেয়া নেই। সোদামিনীর ভারী নিতম্ব প্রায় উন্মুক্ত। ফর্সা টান টান চামড়াটা বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে। পা দুটিও প্রায় খোলা। পায়ের গোছ, উরু বেশ ভারী ভারী। অবশ্য এমনি নারী শরীর তিতুরাম কম দেখে নি। ভগবান যেন ওদের অন্য মাটি দিয়ে গড়েছে।

কিন্তু সোদামিনীর এই শরীর যেন তিতুরাম কল্পনাই করতে পারে নি। সেই আট বছরের সদু বাসর ঘরে যখন বলেছিল, এই তোমলা সবাই চলে যাও আমি আর বর এ ঘরে থাকব, সে সময়ে তিতুরাম অজ্ঞান হয়ে যাবার মত হয়েছিল।

তখন তো তিতুরামের বয়স কম নয়। ও তখন যুবক। তখনই তার জীবনে বহু নারীর সংসর্গ হয়েছে। দু'চারটে ছেলে মেয়ের মুখ যে না দেখেছে তা নয়। এমন কি এও দেখেছে, মেয়েরাও পুরুষ সংসর্গের জন্যে উন্মুখ।

একবার এক কাণ্ড হয়েছিল। মেয়েটির বয়স যাই হোক, দেহ আন্দাজে বেশ ভরাট। শুভদৃষ্টির সময়ে বরের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে মুচকি হাসল। যারা সামনে ছিল, তারা বলল, প্রফুল্ল ভাল করে তাকা। বরকে চিনে রাখ্। আবার তো হারিয়ে যেতে পারে?

প্রফুল্ল সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, এই তো তাকিয়েছি, আর কত ভাল করে তাকাব? ইস্ হারিয়ে গেলেই হল। এই তো চিনে রাখছি। নাকের ওপর একটা তিল। থুতনিটা একটু বাঁকা। গোঁফ নেই, আর চোখ দুটি একটু ছোট।

তিতুরামের নিজের মুখের এই সব বিশেষত্ব কখনও খুঁটিয়ে দেখে নি। প্রফুল্লর কথায় নিজের গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছিল। তাহলে তার চোখ ছোট। থুতনিটা একটু বাঁকা। ঐ শুভদৃষ্টির সময়ে সে নিজের থুতনিতেই হাত দিয়ে দেখেছিল কতখানি থুতনিটা বাঁকা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে নি বাঁকা কাকে বলে।

তারপরও তিতুরামের অভিজ্ঞতার বাকি ছিল। বাসর ঘরে ঢুকে এই মেয়ে বাসর ঘর থেকে নারী পুরুষদের সরিয়ে দিল। বলল, আমার বিয়ে তো বাবা কুলরক্ষার জন্যে দিয়েছে। স্বামীকে আমি পাবও একরাত্রের জন্যে। তোমরা বাপু সরে পড়ো।

কথাটা যে মিথ্যে নয় তিতুরাম জানে। মেয়েরা এই আপন করেই স্বামীকে এক রাত্রের জন্যে পায়। অবশ্য যে সব মেয়েরা ছোট থাকে, তাদের কথা আলাদা।

তা সে জামাই যদি ভিজিট পেয়ে খুশি হয় তবে তো।

কিন্তু ও মেয়ে তৈরি ছিল। দরজা বন্ধ করেই তিতুরামকে বলল, ওগো শুনছ, তুমি কি দাঁড়িয়ে ভাববে নাকি?

না, ভাবব কেন?

তাহলে জামাটা খুলে ফেল না। রাত তো কম হল না, আবার তো ভোর হলেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

কিন্তু তিতুরামের সেই মুহূর্তে ঐ নির্লজ্জ মেয়েটিকে দেখে একটুও ভাল লাগে নি। হোক না এক রাত্রের দেখাশুনা। তাই বলে এমনি হ্যাংলাপনা করবে? মেয়েটি জামা খুলতে শুরু করেছিল। নারী শরীরের শোভাগুলি প্রকট। কখনও ভালও লাগছে, আবার ভাল লাগছে না।

তিতুরাম বলল, তুমি জামাটা পরে নাও। একটু সুস্থির হয়ে বসো। কথা বলি। তারপর না হয়—।

কিন্তু মেয়েটি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, কথা বলার কি আছে? তুমি তো এ রাত্রের পর আর আসবে না।

এখনও তো রাত শেষ হয় নি আমি তো তোমার পাশেই আছি।

মেয়েটি কি ভেবে একবার জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। সেদিন আকাশে জ্যোৎস্না ছিল। তারা ভরা আকাশ। বোধহয় মেয়েটি জ্যোৎস্নাভরা আকাশ দেখতে ভালবাসত।

তিতুরামের পাশে বসে সেই মেয়েটি জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

তিতুরাম বলল, জামা পরলে না।

থাক না। মেয়েটি একটু ঠোঁটে হাসি টানল। তারপর তিতুরামের কাছ ঘেঁষে বসল। ওর ওই যৌবনের ছোঁয়া তিতুরামের শরীরে লাগছে। মেয়েটি যে ইচ্ছে করেই এসব করছে বোঝা যায়। হঠাৎ সে চাপা স্বরে বলল, 'তোমার মতলবটা কি বলত!'

তিতুরাম জানে এইসব মেয়েরা সেয়ানা। এরা মা, মাসী, পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে গল্প শুনে এমনি হয়। তারপর পুরুষের সাহচর্য পেতে চায়।

সে নিজেকে পুরোপুরি বিলিয়ে দিতে চায়। একান্ত ভাবে চায় কিন্তু তিতুবাম ঐ মেয়েকে চাইল না। না চাইলে হবে কি। ঐ মেয়েই তো সব চাওয়া জোর করে আদায় করে নিচ্ছে।

অবশ্য এটা তো সত্যি কথা প্রফুল্লর বাবার যে অবস্থা, কোনদিন খরচ দিয়ে জামাই আনতে পারবে কিনা সন্দেহ। কুলরক্ষা করবার সময়েই কেঁদে বলেছিল, জামাইবাবা, যা কিছু অসুবিধে হল নিজগুণে ক্ষমা করে নিও। মেয়েটা বুকের ওপর বসে অশান্তি জাগাচ্ছিল। অথচ ব্রাহ্মণের সন্তান, বংশের দুর্নাম তো করতে পারি না।

এইসব কথা ভেবেই সে রাত্রে তিতুরাম প্রফুল্লর নির্লজ্জতা ক্ষমা করেছিল।

কিন্তু এমনি নির্লজ্জ মেয়ে যে প্রায় সবই, সে অভিজ্ঞতা তিতুরামের পদে পদে হয়েছিল। কুলরক্ষার বলি জেনেই মেয়েগুলি বোধহয় এমনি দুঃসাহসিকা হয়।

কিন্তু আট বছরের মেয়ে সদু যখন তাকে নিয়ে দরজা বন্ধ করল, তখন অবাক না হয়ে পারে নি।

ঘরের দরজা বন্ধ হলে তাই তিতুরামের মুখখানি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।

তিতুরাম জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছ?

তোমাকে?

কেন আমাকে দেখার কি আছে?

সদু বলল, বাহ্ বলকে দেখব না। মা বলে, বলই তো মেয়েদের ছব।

তিতুরাম শুনে একটু গুম হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, মা আর কি বলে?

সদু বলল, মা বলে, বল্ যদি মেয়েদের ভাল না বাসে তাহলে মেয়েদের জীবন মরুভূমি হয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি আমায় বাল বাসবে না।

তা না বাসার কি আছে?

সদু হঠাৎ ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, বাহ: আমার তো অনেক থতীন আছে, তাদের বাল না বেসে বুঝি আমায় বাল বাসবে?

মেয়েটা যে আট বছরেই ডেঁপো হয়ে উঠেছে, এটা আর তিতুরামের অজানা থাকে না। আর হবে না কেন মেয়েরা জন্মেই যখন জেনে গেছে তারা স্বামীর জন্য উৎসর্গীকৃত। স্বামী রাখলে তারা সৌভাগ্যবতী, আর স্বামী অবহেলা করলে তাদের কোন দাম নেই।

সদু আবার বলল, তাহলে তুমি আমায় বালবাসবে তো!

বাসব।

সদু বলল, কই এখনও তো বালবাসছ না। আমি তোমার সামনে রয়েছি।

ভালবাসার কি মানে করছে তিতুরাম সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল না। একটু চুপ করে রইল।

হঠাৎ সদু ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল। আমি জানি তুমি আমায় বালবাসবে না। তিতুরাম একটু ঘাবড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তাকে শান্ত করার জন্যে নানান কথা বলে বোঝাল। সেই বোঝানোর মধ্যে জানা গেল, পাড়ায় কার যেন বিয়ের সময়ে সদু আড়ি পেতে বাসর ঘরে দেখেছে বর বউকে কাছে টেনে নিয়ে খুব আদর করছে।

সদু শেষটা আর বলল না মুচকি হেসে চোখের জল মুছল।

সেই সদু সেদিন তিতুরামের কোন কথাই বুঝতে চায় নি। ছোট মেয়েকে যেমন করে আদর করে, তেমনি ভাবে আদর করেছিল।

সদু বলেছিল, তুমি অমন করছ কেন? রাধার বল রাধাকে কত চুমু খায়।

বিশ বছরেব তিতুরাম আট বছরের এক ডেঁপো মেয়েকে সারারাত ধরে চুমু খেয়েছিল।

অবশ্য এই আট বছরের মেয়ের অজ্ঞানতা যখন সদু একটু বড় হয়েছিল বুঝতে পেরেছিল। ওর বাবা যখন খরচ করে জামাই এনেছিল, প্রথম মিলনের রাত্রে সদু বলেছিল, আচ্ছা আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, আমি বাসর ঘরে তোমায় খুব জ্বালিয়ে ছিলাম না!

তিতুরাম বলেছিল, সে কথা তোমার মনে আছে?

সদু বলেছিল, মনে আবার নেই। ক'বছরই বা আগের ঘটনা। তুমি কিছু মনে কর নি তো!

মনে করলে আর কি করার আছে!

ভাবলে মেয়েটা কি বেহায়া?

তা একটু তো বটেই!

সেই আট বছরের সদু যে কাণ্ড করেছিল, পনের বছরেও কম কাণ্ড করল না। পনের বছরে সারারাত ধরে যুদ্ধ করতে লাগল। তখনই তিতুরাম বুঝেছিল, সৌদামিনী নামের এই মেয়ে অল্পে খুশি নয়।

তাই যখন সৌদামিনী ও নীলুর সঙ্গে বাড়ি এসে পেঁছিল, একটু মনে মনে মুষড়ে রইল।

সৌদামিনী বাড়ি এসেই বলল, নীলু, তোর বাবার জন্যে পুকুর থেকে ভাল মাছ তুলে নিয়ে আয়। আর ততক্ষণ নতুন গরুটা দুইয়ে কিছু ভাল দুধ এনে তোর বাবাকে দি। দেখছিস না ঘুরে ঘুরে মানুষটার কি চেহারা হয়েছে?

নীলু বলল, তুমি দুধ দুইতে যাবে কেন মা? গরুটা ভীষণ লাথি মারে।

সৌদামিনী বলল, তুই থাম তো। তোর চেয়ে আমি কি কম কাজের?

নীলু লজ্জিত হয়ে বলল, না তা বলি নি মা। ও যে ভীষণ লাথি মারে তাই তোমায় সাবধান করে দিচ্ছিলাম। বাঁটে হাত দিলেই তো ক্ষেপে যায়।

সৌদামিনী একবার অপাঙ্গে তিতুরামের দিকে তাকিয়ে হাসি লুকোল। তারপর ছেলেকে বলল, তুই যা তো, আমায় লাথি মারবে না দেখে নিস।

সৌদামিনী এবার তাকে নিয়ে নানান হাসি মস্করা শুরু করল। এবং তার পেছনের রহস্যটুকুও তিতুরামের একেবারে অজানা নয়!

সৌদামিনী বলল, তুমি কিন্তু এখন আর দু চারদিন এ বাড়ি থেকে আর নড়বে না।

তিতুরাম বলল, সে কি করে হয়? আমার যে অনেক জায়গায় যাবার কথা।

সৌদামিনী ধমকে উঠল, যাবার আছে, যাবে না। সতীনদের বাড়ি থেকে যা পেতে আমায় বলো আমি তোমায় দিয়ে দেব।

সৌদামিনীর তো অনেক আছে। নীলু সেই সব ঘুরে ঘুরে দেখাল। বাড়ির মধ্যেই কটা গোলা, সেই গোলায় ধান, ঘরের মধ্যে ডাল, চাল, ক্ষেতে আনাজ, পুকুরে মাছ। দেখতে দেখতে তিতুরামের বার বার মনে হচ্ছিল, এরকম বহু স্ত্রী তার সঙ্গতিপন্না। তাদের কারো বাড়িতে থাকলে তারা রাজার হালে রাখবে। তাকে আর এই উঞ্ছবৃত্তি করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে না। কিন্তু কি যে তার অভাব, কোথাও একদিনের বেশী মন টেঁকে না।

সৌদামিনী ঘণ্টা খানেকের মধ্যে অনেক কিছু রান্না করল, খেতে বসে চক্ষুস্থির।

সৌদামিনী খেতে বসিয়ে বলল, পাতে কিন্তু একটুও কিছু ফেলে রাখবে না। বুঝলে!

কিন্তু এই এতো বড় রুইমাছের মুড়ো কি খাওয়া যায়? নীলুকে বরং এটা দাও।

সৌদামিনী ধমকে উঠল, নীলুর জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি খাও তো!

এর মধ্যে ক্ষীরও দেখছি করেছ। এত তাড়াতাড়ি এসব করলে কেমন করে?

নতুন গরুটার দুধটা ভাল। খুব ঘন। তুমি তো আর আস না। আমরা অনেক ক্ষীর করে খেয়েছি।

কিন্তু এতটা ক্ষীর খেলে ঠিক হজম হবে না সৌদামিনী।

সদ্ বলতে বলতে আবার সৌদামিনী হয়ে গেলাম কখন!

তিতুরাম তাড়াতাড়ি অপ্রতিভ হয়ে সংশোধন করে নিল। সদ্ যে সৌদামিনী বললে রাগ করে এটা ওর জানা ছিল। বলল, সদ্, ক্ষীরটা একটু কমিয়ে নাও। পেটটা গোলমাল হয়ে গেলে আমি পথ চলতে পারব না।

সদ্ বলল, পথ চলতে দিচ্ছি তোমায় কত! খেয়ে দেয়ে কোমরের কাপড় আলগা করে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমি বিছানা করে রেখেছি কোন অসুবিধা হবে না।

তিতুরামকে সবই খেতে হল, কোন প্রতিবাদ করা গেল না। সৌদামিনী শুনলই না। খাওয়াটাও হয়ে গেল খুব বেশী। গতরাত্রেও খাওয়াটা ভালই হয়েছিল। শ্যামাচরণ খরচ দিলেও কি ঐ বিমলাকে গ্রহণ করা যেত? অবশ্য সে যদি না শুনতে পেত তাহলে সন্তান তার বলেই প্রমাণিত হত।

তিতুরামকে এমন বহু সন্তানের কি বাবা হতে হয় নি? কোন্ বাড়ি কখন গেল, রাত্রিবাস করল কি করল না এসব কি তার মনে থাকে? কটা বিয়ে, কটা বৌ তাই মনে নেই তো ছেলে। সব তো ঐ খাতা। খাতাটাও এত পুরোনো হয়ে গেছে যে কোনদিন কাগজগুলো ঘামে ভিজে গলে গলে পড়বে! কত শ্বশুরবাড়ির নাম ঠিকানাই ঝাপসা হয়ে গেছে।

একবার একটা ভয়ংকর বিপদে পড়েছিল। ভেটে গ্রামের একটা পুকুর থেকে একটি যুবতী বউ বাসন মাজতে মাজতে উঠে এসে গলায় কাপড় দিয়ে ঢিব করে প্রণাম করে বসল। তিতুরাম যথারীতি পৈতে বের করে বউটিকে আশীর্বাদ করল। ও ভেবেছিল বউটি এবার পুকুরে নেমে যাবে কিন্তু তা গেল না। ঘোমটা একটু নামিয়ে দিয়ে চুপ করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

তিতুরামও চলার পথে বাধা পেল। জিজ্ঞাসা করল, আর কিছু বলবে?

মেয়েটা ঘোমটা একটু ফাঁক করে বলল, আমাদের বাড়িতে তুমি যাবে না!

তুমি? তিতুরামের একটু খট্‌কা লাগল। তাহলে এও তার কোন বউ নাকি! কিন্তু সে কথা না বলে তিতুরাম বলল, আমার তো এখন সময় নেই। তুমি কার মেয়ে?

আমার বাবার নাম ঈশ্বর চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বর! তাহলে মেয়েটির বাবা মারা গেছে? তুমি এখন কার কাছে থাকো?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। হঠাৎ শোনা গেল ঘোমটার মধ্যে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এ তো মহা জ্বালা হল! একটা শুভ কাজে বেরিয়ে বাধা। তিতুরাম জিজ্ঞাসা

করল, তা তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন? আর আমারই বা পথ আগলে রয়েছ কেন?

মেয়েটি তখনও কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল, ভাইয়ের বাড়িতে আর কতদিন থাকব? স্বামী যদি থেকেও না দেখে।

স্বামী? তোমার স্বামী কে? তোমায় সে দেখে না কেন?

মেয়েটি বলল, যে বলছে সেই তো সেকথা জানে।

তিতুরামের চক্ষু তখন ছানাবড়া। আমি, আমি তোমার স্বামী?

তা নয়ত কে? আমি কি না জেনে ছুটে এসে প্রণাম করেছি!

অ, এইজন্যে তুমি প্রণাম করেছ?

তা নয়ত কি?

মেয়েটি যে এবার বেশ মুখ খুলেছে তিতুরাম সেটা দেখতে পেল। আসলে মেয়েটি বোধহয় মুখরা। কিন্তু তিতুরাম কিছুতে এই মেয়েটিকে কবে বিয়ে করেছিল মনে করতে পারল না। জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বাড়ি যেন কোন্‌টি?

মেয়েটি দূরে একটা আমগাছের পিছনে আঙুল দিয়ে দেখাল। কিন্তু এই গ্রামে তিতুরামের তিনটে বউ আছে। তাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

তিতুরাম জিজ্ঞাসা করল, তোমার নামটা যেন কি?

মহামায়া।

হাসি পেল তিতুরামের। অভাগীর যথার্থ নামই বটে।

মহামায়াই আবার জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বাড়িতে তুমি যাবে না! একবার অন্তত চলো। আমার বৌদি অন্তত দেখুক, আমার স্বামী আছে।

কিন্তু এ যে তার স্ত্রী এই তো তিতুরাম মনে করতে পারছে না। তখন খাতাটাই খুলতে হল। ভেটে গ্রামে তিনটে বিয়ের বৌয়ের নাম, বৌয়ের বাবার নাম সবই আছে কিন্তু একটা জায়গায় ঝাপসা, কিছু পড়া যাচ্ছে না। সূর্যের আলোতেও কিছু পড়তে না পেরে তিতুরাম হাল ছেড়ে দিল।

মহামায়া বলল, পেয়েছ?

তিতুরাম বলল, না।

মহামায়া বলল, সে কি? আমার বাবার নাম চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়। বাবাই তো তোমায় এনে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল।

তুমি ঠিক জানো! ভুল করছ না তো? হয়ত অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কুলরক্ষা তো আমি একা করছি না, অনেকে আছে।

মহামায়া আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওর মুখের ওপর আর ঘোমটা ছিল না। মাথার ওপর উঠে গেছে। মুখখানি সুন্দর। বোধ হয় অবহেলায় দিন যাপন করছে। তাই চোখের নিচে কিছু কালি জমেছে। মহামায়া বলল, আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমি স্বামীকে চিনতে পারছি না!

না, তা বলছি না। ভুল তো হতে পারে।

কেন, খাতা তো দেখলে, নাম খ‍ুঁজে পেলে না!

পেলাম না বলেই তো তোমায় জিজ্ঞাসা করছি। একটা জায়গায় কালি ঝাপসা হয়ে গেছে।

মহামায়ার বড় বড় চোখ দ‍ুটি দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। আমি জানি আমার জীবন এমনি ঝাপসাই হয়ে যাবে। হঠাৎ মহামায়া কোন কথা না বলে প‍ুকুরের দিকে এগিয়ে গেল।

তিতুরাম কেমন করে যেন ব‍ুঝতে পারল, তাড়াতাড়ি ছ‍ুটে গিয়ে তার হাতখানি চেপে ধরল। তুমি কোথায় যাচ্ছ?

প‍ুকুরে ডুবে মরতে। এ প্রাণ আর রাখব না।

বেশ, তুমি আমাব বউ, হল ত। এখন আমায় যেতে দাও, অনেক কাজ রয়েছে।

তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে না!

তোমাদের বাড়ি?

হ্যাঁ তো!

এ মেয়ে যখন ছাড়বে না। তখন যেতেই হবে। কিন্তু তিতুরাম ওদের বাড়ি যেতেই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

একজন স্থ‍ূলকায়া মহিলা ঘর থেকে দ্র‍ুত বেরিয়ে এসে মহামায়ার চুলের ম‍ুঠি ধরে বলল, পোড়ারম‍ুখী, ভায়ের ভাত ধ্বংস করছ, আর ছেনালীপনা করছ? এ লোকটাকে আবার কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলে?

মহামায়া বলল, আমার স্বামী।

হঠাৎ স্থ‍ূলকায়া ঘোমটা দিয়ে মহামায়াকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল। ওমা তাই নাকি? সত্যি!

তিতুরাম জানে না, সত্যি মহামায়া তার স্ত্রী কিনা, একবার এলে বাড়ি দেখে তো চেনা যায় না। তাছাড়া খাতায় যখন নাম নেই তখন স্ত্রী নয় বলেই ধরে নিতে হবে। তব‍ু এই মেয়েটির দ‍ুরবস্থায় তিতুরামের হৃদয়টা কেঁদে উঠল। বলল, হ্যাঁ, সময় পাই না তাই আসতে পারি না। তা আমায় তো ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেত।

স্থ‍ূলকায়া তখন একট‍ু অন্য মান‍ুষ হয়ে গেছে। ঘোমটার আড়ালে ম‍ৃদ‍ুকণ্ঠে বলল, আমাদের কি সে অবস্থা আছে?

সেদিন ঐ মহামায়ার দ‍ুঃখেই মহামায়ার বাড়িতে তিতুরাম রাত্রিবাস করেছিল। মেয়েটি বড় দ‍ুঃখী। ও জামাইয়ের খরচ কোথায় পাবে?

এক এক সময়ে তিতুরাম ব্যবসার আসল স্বর‍ূপ থেকে সরে কোথায় যে চলে যায় সে নিজেই জানে না। তখন বোধ হয় সে আঠার বছরের আগের সেই জীবনে ফিরে যায়।

সেদিন মহামায়ার ম‍ুখের হাসিট‍ুকু দেখে তিতুরাম যে কি খ‍ুশি হয়েছিল!

এমনি মাঝে মাঝে তার কি যে হয়ে যায়?

পরে এই মহামায়ার কথাই শুনেছিল, একটি ছেলে হয়েছে। ছেলে দেখতে আর যায় নি কিন্তু খুশি হয়েছিল।

তিতুরাম সেবার অন্তত একটা ভাল কাজ করতে পেরেছে।

কি এখনও ঘুমোও নি?

সৌদামিনী পান মুখে দিয়ে ঘরে ঢুকল।

না, বসে আছি তোমার জন্যে। এই খাওয়া হল?

হ্যাঁ, মেয়েটাকেও ঘুম পাড়াতে হল। রোগা মেয়ে ভুগে ভুগেই শেষ হয়ে গেল। দেখি মা শেতলার চন্নমেত্তর এনেছি খেয়ে যদি কিছু হয়।

সৌদামিনী পান চিবুতে চিবুতে তিতুরামের পাশে বিছানায় উঠে বসল।

তিতুরাম বলল, দরজা খোলা রয়েছে, কি করছ, নীলু এসে পড়বে না।

সৌদামিনী মুচকি হাসল, নীলু তোমার চেয়ে সেয়ানা। মা বাবা ঘরে রয়েছে না, সে কখনই এদিকে আসবে না।

তবু!

সৌদামিনী জানলা দিয়ে পানের পিক ফেলে এসে বলল, রাখ তো তোমার তবু। কালে ভদ্রে একবার আসো। মনের আশ মিটিয়ে তোমার সঙ্গ নিয়ে নেব না।

আর তারপর যদি আর একটা লক্ষ্মী আসে? তিতুরাম একটু হাসবার চেষ্টা করল।

আমি খুব আনন্দ পাব। সৌদামিনী আবার পানের পিকটা জানলা দিয়ে ফেলে এল। আমার কি কোন অভাব আছে?

অভাব যে সত্যি নেই তিতুরাম সেটা দেখেছে। বলল, তুমি কি ধৃতরাষ্ট্রের বউ গান্ধারীর মত শত পুত্রের জননী হতে চাও?

হলে ক্ষতি কি? তুমি কি তা হতে দেবে? সেই যে দু'বছর আগে এসে ক'দিন ছিলে। অবশ্য সে ক'দিনও থাকতে না, অসুখ করে গেল বলে বাধ্য হয়ে থেকে গেলে।

তিতুরাম একটু মুচকি হেসে বলল, সেইজন্যে তো লক্ষ্মী এল।

কথার মাঝে কথা এল বলে সৌদামিনী একটু থেমে গেল, তারপর পানের টোকলা এ গাল থেকে ও গালে নিয়ে বলল, হ্যাঁ সেইজন্যেই এল।

অমনি টপ্ করে তিতুরাম বলল, অবশ্য এ অনুমান। অন্য কারও তো হতে পারে?

সঙ্গে সঙ্গে সৌদামিনী চোখ পাকিয়ে বলল, কি বললে আমি খারাপ মেয়েছেলে নাকি?

তিতুরাম সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলল, না না চুপ কর। অত চেঁচিয়ে কথা বলছ কেন? নীলু যে শুনতে পাবে।

সৌদামিনী বলল, শুনুক। বাপ তার মাকে খারাপ বলছে এ কথা ছেলে শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আমি যদি খারাপ হতুম তাহলে কি তোমাকে আনবার জন্যে এত পীড়াপীড়ি করতুম? দু দুটো চিঠি দিলুম। লোক পাঠালুম।

তিতুরাম চুপ করে রইল। প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে কথা ঘোরাল।

তুমি আজ রান্নাটা সত্যিই ভাল করেছিলে।

সৌদামিনীর কানে বোধ হয় সে কথা গেল না। বলল, আজই মা শেতলার কাছে কেঁদে কেঁদে আমার প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম।

কি প্রার্থনা?

যেন ঠাকুর তোমায় এনে দেয়। তা দেখলুম মা শেতলা সত্যিই জাগ্রত। সঙ্গে সঙ্গে ফল ফলল।

সৌদামিনী আর একটু সরে এসে তিতুরামের পাশে বসল। একে দুপুরবেলা। চারদিকে আলো। তারপর দরজা খোলা। তিতুরাম শুধু মৃদুকণ্ঠে বলল, সদু দরজাটা না হয় বন্ধ করে এস।

তাই দিয়ে আসি। বলতে বলতে সৌদামিনী উঠছিল, এই সময়ে বাইরে থেকে নীলু বলল, মা আমি একটু মন্মথদের ওখান থেকে ঘুরে আসি। বাবা কি আজই চলে যাবে?

সৌদামিনী স্বামীর দিকে তাকিয়ে তারপর নিজেই জবাব দিল, যেতে দিলে তো! তুই বেশীক্ষণ মন্মথদের বাড়িতে থাকিস না।

নীলু বলল, কতক্ষণ থাকব বলো, তারপর না হয় চলে আসব।

ঘণ্টাখানেক পরেই চলে আসিস।

নীলু চলে গেলে তিতুরাম বলল, তোমার ছেলে তো তোমার খুব বাধ্য।

ঐটুকুই সম্বল। সে তো আমার দুঃখ দেখছে। তাই অবাধ্য হয় না।

সৌদামিনী এবার নিজেই গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে এল। তারপর তিতুরামের পাশে শুয়ে পড়ে বলল, আমি কিন্তু তোমায় সাতদিনের আগে ছাড়ছি না।

না সদু, তাহলে খুব মুস্কিল হয়ে যাবে।

সৌদামিনী বলল, কি মুস্কিল হবে শুনি? তোমার যা লোকসান হবে, আমি যাবার সময়ে দিয়ে দিলেই তো হল। কেন সেবার যখন গেলে দিয়ে দিই নি।

তা দিয়েছ। কিন্তু এবারে একটা বিয়ে আছে।

হঠাৎ সৌদামিনী বুকে জোয়ার তুলে খিল খিল করে হেসে উঠল। নব কার্তিক। এখনও বিয়ে করছ? ক' বছরের মেয়ে বল তো!

তিতুরাম রুষ্ট হয়ে বলল, অমন করে কথা বলো না সদু। অর্থশালীর মেয়ে। খরচপত্তর ভালই দেবে। ত্রয়োদশী।

সৌদামিনী আবার খিল খিল করে হেসে উঠল, ত্রয়োদশী! বাহ্ ষাট বছরের

বুড়োর সঙ্গে ত্রয়োদশী জমবে ভাল। মেয়েটিকে দেখেছ নাকি? বেশ ডাগর হয়েছে, না এখনও বালিকা আছে?

সদু অমন করে কথা বলো না, আমার খুব খারাপ লাগছে।

সৌদামিনী বলল, তবে কেমন করে কথা বলব? তোমরা এই কুলীন ব্রাহ্মণেরা সত্যিই এক একজন দেবতা। তুমি কি তোমার এই ব্যবসা ছাড়তে পার না?

তিতুরাম চুপ করে রইল।

তারপর সৌদামিনী ঘনিষ্ঠ হয়ে সরে এসে বলল, যাই বলো, তোমাকে আমি সাত দিন আর ছাড়ছি না। আগে আমার সুখ তারপর তো অন্যের।

তিতুরাম একবার আড়চোখে সৌদামিনীর ভরাট দেহের দিকে তাকিয়ে সেই কথা ভাবতে লাগল। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে যে কত নির্লজ্জ এই সৌদামিনীই তার প্রমাণ। ও স্বামীকে বাগে পেয়েছে, ঘরে আছে টাকা। খরচের কোন ভয় নেই, সে তার সুখ, আনন্দ স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

আর কিছুক্ষণের মধ্যে তা নিলও। ষাট বছর বলে যে ব্যঙ্গ করেছিল সুখে ভাসতে ভাসতে নিজেই বলল, তোমার বয়সের সঙ্গে আমার বয়েসের অনেকটা মিল আছে। পুরুষদের বয়স হলেই মেয়েদের ভাল লাগে। তারপর হেসে বলল, সত্যিই তাই না!

সেই সৌদামিনী সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে এখন ঝিম হয়ে পড়ে আছে। অনেক আনন্দের পর অনেক প্রশান্তি, কাঙাল মন দু' বছরের পর ভরে গেছে।

তিতুরামের অভিজ্ঞতাও কম হল না। সেই আঠার বছর থেকে শুরু হয়েছে, এখন পাঁচের কোঠা যায় যায়।

কিন্তু এখানে আর থাকা নয়। সৌদামিনী জেগে উঠলে ঠিক আটকে দেবে। দু'বছর আগের ঘটনা মনে আছে। ওর পাল্লায় পড়ে এখানে অনেক দিন থাকতে হয়েছিল।

তিতুরাম উঠে দাঁড়াল। পুঁটুলী আর গামছাখানা হাত বাড়িয়ে নিল। নীলু আসবার আগে সরে পড়তে হবে। মন্মথদের বাড়িটা কোথায় কে জানে। ওর সামনে পড়ে গেলে আবার সৌদামিনীর হেপাজতে।

দরজা খুলে একবারে পথে। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে ভৈটে গ্রামের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হুগলী জেলায় সেই সময়ে ভঙ্গ কুলীনদের বিয়ে-বিয়ে ব্যবসার যেন একটা হিড়িক লেগে গিয়েছিল। অন্য কোন ব্যবসার যেমন ঝুঁকি আছে, এ ব্যবসায় নেই। তার ওপর আয়টাও ভাল। যেমন নিষ্কর্মা লোক কিছু যোগাড় করতে পারল না? অথচ ব্রাহ্মণ, তারা এ কাজে লেগে পড়ল। বলার তো কেউ নেই।

বহু কুলীন কন্যারা বিয়ে অভাবে আইবুড়ো নাম ঘোচাতে পারছে না। অথচ বংশ গৌরব আছে।

কুলীন কন্যাদের এই বিপদে এই সব ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণরা এগিয়ে এল। কুলীন কন্যাদের বাবারা যেন হাতে স্বর্গ পেল। শুধু তো আইবুড়ো নামটা ঘোচানো। তারপর মেয়েদের কি হল জানার দরকার নেই। বংশটা বাঁচলেই হল।

এই বংশ বাঁচানোর জন্যে কত মেয়ের চোখের জলে বুক ভাসল সে কারুর জানার দরকার নেই।

প্রতিবাদ মেয়েদের মধ্যে দেখা দিলেও তাদের কথা বলার উপায় নেই। তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হল। ভ্রূণ হত্যা করতে লাগল। তবু সেই কুলরক্ষা নির্বিবাদে চলতে লাগল।

শুধু হুগলী নয়, বর্ধমান, বাঁকুড়া, যশোর, বীরভূম, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা সব জেলাতেই এই কন্যাদের পীড়ন চলতে লাগল। কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এর ন্যূনতম প্রতিবাদ করতে গেল কিন্তু তাদের কথা টিকল না। সমাজ প্রধান এই ব্রাহ্মণরা তাদের সামাজিক প্রথা শাস্ত্রের বিধান বলে দেখাতে লাগল।

কিন্তু একজনের মন কাঁদল, তিনি বললেন, এ ভুল। বহু বিবাহ করা শাস্ত্রের বচন নয়। এ ঘোরতর পাতকের কাজ। দেবীবরের কপোল কল্পিত প্রথায় আশাবাদী হয়ে, ব্রাহ্মণরা চরম ভুল করছে।

তিনি আর কেউ নন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথায় কেউ কান দিল না। কুলরক্ষা আগের মতই চলতে লাগল।

কলকাতায় এই নিয়ে দুটো দল হয়ে গেল। একদল বললে, মেয়েদের এই নির্যাতন বন্ধ হোক। আর একদল বললে, শাস্ত্রের নিয়ম পালন করা হোক।

তখন সতীদাহ ও বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেছে। তার জন্যে আন্দোলন করেছেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর বললেন, না শাস্ত্রের কোথাও নেই বহু বিবাহ প্রথা। তিনি শাস্ত্র থেকে তুলে তুলে অন্ধ শাস্ত্রকারদের দেখালেন।

কিন্তু শাস্ত্রকারেরা মাথা নাড়ল, বলল, না, ওসব আমরা শুনব না। মেয়েদের দুঃখ দেখে আমরা শাস্ত্রের নিয়ম ভাঙ্গব না। তাছাড়া মেয়েদের দুঃখ কি? মেয়েরা তো ঠিক পার হয়ে যাচ্ছে।

সমাজ সংস্কারক বলল, এই কি মেয়েদের পার হওয়া? নমো নমো করে শুধু বিয়ের নিয়ম পালন করা হচ্ছে। আসলে মেয়েরা কি পাচ্ছে?

শাস্ত্রকার বলল, মেয়েরা আর কি চায়?

সমাজ সংস্কারক বলল, মেয়েদের আর কি কিছু চাওয়ার নেই? স্বামী সুখ তারা পেল কোথায়? স্বামীকে একদিনের জন্যেও কি কাছে পেল? ওদের কোন আশা আকাঙ্ক্ষা নেই? ওদের কোন প্রার্থনা নেই?

শাস্ত্রকার বলল, ওদের কি কোন প্রার্থনা আছে? সে তো পুরুষদের একচেটিয়া। পুরুষরাই তো দু'পাঁচটা মেয়ে পেলে খুশী হয়। ওদেরই ভগবান বেশি সব চেয়ে ভোগের ক্ষমতা দিয়েছেন।

সমাজ সংস্কারক হেসে বলল, এটাই তো সব চেয়ে ভুল ধারণা। মেয়েদের আমরা অন্তঃপুরে বন্ধ করে রেখেছি। যখন আমাদের খুশি হয়, ওদের ব্যবহার করি কিন্তু কখনও জানতে চাই না ওদেরও কোন আশা আকাঙ্ক্ষা আছে কি না! ওরা যে নির্জীব পদার্থ নয়। ওদেরও যে প্রাণ আছে, ওদেরও যে চাওয়া পাওয়া আছে, এটাই আমরা ভুলে যাই।

শাস্ত্রকার বলল, এটা নতুন কথা শোনাচ্ছ। ওদের আবার চাওয়া পাওয়া আছে না কি?

সমাজ সংস্কারক বলল, সেটা ওদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।

শাস্ত্রকার ভয়ে সেটা জিজ্ঞাসা করল না। পাছে ওরা ওদের মত প্রকাশ করে। বরং শাস্ত্রকার মদন পারিজাত ধৃতস্মৃতিঃ খুলে দেখাতে লাগল—

'একামূঢ়া তু কামার্থমন্যাং বোঢ়ুং য ইচ্ছতি।
সমর্থস্তোষয়িত্বার্থৈঃ পূর্বোঢ়ামপরাংবহেৎ॥'

অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক স্ত্রী বিয়ে করে রতি কামনায় যদি অন্য স্ত্রী বিয়ে করতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে আগের স্ত্রীকে টাকা দিয়ে বশ করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।

সমাজ সংস্কারক বলল, শাস্ত্রের এ নিয়ম ভুল। শাস্ত্র বানিয়েছে পুরুষরা। পুরুষরা নিজেদের মতো নিয়ম করে নিয়েছে। তাহলে স্ত্রীরাও অনেক বিয়ে করতে পারে।

শাস্ত্রকার নাক সিঁটকে বলল, তাহলে সে স্ত্রী জাতিকে বহুবল্লভা বলা হবে।

সমাজ সংস্কারক বলল, তাহলে দ্রৌপদী কি বহুবল্লভা?

শাস্ত্রকার চুপ।

এ সব দলাদলি চলতে লাগল কলকাতায়। প্রধান হলেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি আবার বহু বিবাহ সম্বন্ধে দুখানি বই লিখে ফেললেন। সে বইয়ের তিনটে সংস্করণ হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর মশাই তখন বিধবা বিবাহ আন্দোলন করে জয়ী হয়েছেন, তাঁর শরীরে মত্ত হস্তীর বল। তিনি স্ত্রী জাতির এই দুঃখে কোমর বেঁধে লাগলেন।

কিন্তু এসব তো আন্দোলন শহরে হচ্ছিল। গ্রামাঞ্চলে আগের নিয়ম বজায় ছিল। তারা যেন শুনেও কান দিচ্ছিল না। আর শুনে কি হবে? এই মজাদার ব্যবসা ছাড়লেই তো লোকসান।

তিতুরামও ওসব ভ্রূক্ষেপ করে না। তার কি সময় আছে এসব শোনবার? তার যে অনেক কাজ। সারা বছর এতটুকু ফুরসৎ মেলে না। বাড়িতেই বা কদিন থাকে? এই তো শ্বশুর বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে আবার বছর ঘুরে আসে।

সেই তিতুরাম মাথায় ভেজা গামছাখানা দিয়ে বৈঁচী গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছিল। গামছাখানা ভিজিয়ে নিয়েছে একটা পুকুর থেকে।

সৌদামিনীর বাড়ি থেকে অবশ্য সোজাই চলে এসেছিল। মন্মথর বাড়িটা কোন দিকে তিতুরাম জানে না। নীলু দেখতে পেলেই আবার তিতুরাম তার কন্যা হয়ে যাবে।

সৌদামিনীর পাল্লায় পড়লে আবার সে অসুখে পড়ে যাবে। সেবার তো তাই হয়েছিল। পাঁচের কোটা যায় যায় এখন কী ঐ দামাল বৌয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই তিতুরাম পাবে?

ও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল চেনা চেনা মনে হচ্ছে? কাছে আসতে ঠাহর হল নিতু ভট্টাচার্য। নিতু ভট্টাচার্য তিতুরামকে দেখলেই একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকায়। আজও তাকাল, কি দাদু, আর কতকাল চলবে? ছুটি নেব না।

তিতুরাম রাগের দৃষ্টিতে নিতুর দিকে তাকাল, আমায় দাদু বলছ যে বড়? আমি কি তোমার দাদু নাকি?

নিতু হা হা করে হাসল। দাদু বলব না কি বাবা বলব? তোমার বয়স দেখো, আর আমার বয়স দেখো। একই তো ব্যবসা করি। আর এ ব্যবসা চালাচ্ছ কেন? মরলে কটা মেয়ের সিঁথি থেকে সিঁদুর তুলবে?

তা তোমার কি? তুমি যে কাজে যাচ্ছ যাও না!

আহা তাই তো যাচ্ছি। তবু দেখা হল, কুশল প্রশ্ন করব না!

এই কি কুশল প্রশ্ন?

নিতু ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হ্য হ্য করে হাসতে লাগল। পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে সরানো তিতুরামের কর্ম নয়। হুঁ এ বয়সও তিতুরামের একদিন ছিল। তখন মামা ঐ রামহরি মুখোপাধ্যায়ও তিতুরামকে দেখে ঈর্ষা করত। মামাই তিতুরামের এ ব্যবসার গুরু। কিন্তু যখন তিতুরামের রমরমে অবস্থা, একদিন শুনল, মায়ের সঙ্গে মামার কথা হচ্ছে।

তিতুটা আমার ব্যবসাটা একেবারে মাটি করে দিলে। এখন দেখছি, ঘরের টাকা ভেঙেই খেতে হবে।

মা বলল, তা তিতুকে তুমিই তো এ ব্যবসা শেখালে। না হলে আমি তো রগুর সঙ্গে ওকে চাষ বাসের কাজ শিখতে পাঠাচ্ছিলাম।

মামা বলল, সেটাই আমার কাল হয়েছে। সেই মামার বয়স হয়েছিল, এখন তিতুরামের বয়স হয়েছে। ঐ নিতু তাকে ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়াতে বলছে।

তিতুরাম নিতুর দিকে তাকাল। নিতু তখনও মুচকি মুচকি হাসছে।

নিতু বলল, তা খুড়ো মহাশয় কোথায় যাওয়া হবে ?

খুড়োমশায় ? দাদু থেকে খুড়ো ! ছোঁড়াটা ভেবেছে কি ? তিতুরাম চটে উঠল, যেখানে যাই, তোমার দরকার কি বাপু ?

না তাই জিজ্ঞাসা করছি। যা রোদ উঠেছে। খুড়ো মশাইয়ের চাঁদি যে গরম হয়ে উঠল। কেন এ গ্রামে কোন খুড়ি নেই ? খুড়িমার কোলে শুয়ে অন্তত দুপুরটা কাটালে তো পারতে !

এই লোকটার সঙ্গে দেখা হলেই লোকটা এমনি সব নোংরা রসিকতা করে। এমন গা জ্বালা করে ওঠে ! মনে হয় এক থাপ্পড় দিলে রাগ যায়। ও যেন মনে করে, তিতুরামের আর এ ব্যবসার ওপর কোন এক্তিয়ার নেই। মানে মানে সরে না পড়লে গলা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে। একটু পাশ হতেই তিতুরাম দ্রুতবেগে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

আর অমনি পিছন থেকে হ্য হ্য করে হাসি—খুড়ো যেন খুড়িদের মাংস বিক্রী করে পথ চলছে। তিতুরাম নিজের শরীরের দিকে তাকাল। তাই তো দিন দিন শরীরটা যেন পাকিয়ে যাচ্ছে। বয়স যে হচ্ছে বোঝাই যায়। এমনি শরীব ছিল রাখহরি মামার।

তিতুরাম গামছাটা মাথায় ভাল করে দিয়ে আবার পথ চলতে লাগল। অনেক পথ তাকে হাঁটতে হবে। বৈতল থেকে বৈঁচী। তা অনেক পথ। সূর্যের আলোও প্রায় কমে আসছে। অন্ধকার হলে আবার তিতুরাম পথ দেখতে পারে না। চোখে কম দেখে।

গত রাত্রে শ্যামাচরণের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমন মুস্কিল হয়েছিল। ভাগ্যিস্ জ্যোৎস্না উঠেছিল, তবু গাছতলায় শুয়ে থাকতেও তিতুরামের অসুবিধে হয় নি। সারারাত আর জ্যোৎস্না থাকেনি। আলো সরে গিয়েছিল। আলো সরে যেতেই নিবিড় অন্ধকার। আর সে অন্ধকারে দেখতে পায় না। সে যে কি অবস্থা, তিতুরাম কাউকে বোঝাতে পারবে না।

এখন সে বুঝতে পারে, সত্যিই তার বয়স হয়েছে। কিন্তু যে তাকে ক্ষেপায়, অন্যায় করে না।

কিন্তু এর জন্যে কি করতে পারে তিতুরাম ! ঐ রাখহরি মামাই তো তার সর্বনাশ করেছিল। দুটো বিয়ের পর তো সে বেঁকেই বসেছিল।

মা বলল, তাহলে যা যগুর সঙ্গে চাষবাস করগে। আমি তো আগেই বলেছিলাম, তোর এসব পোষাবে না।

মা যে খুশি হয়েছিল তিতুরাম দেখেছিল। মা যে খুশি হবে এ সে জানত। নির্যাতিত মেয়েদের মধ্যে মাও তো একজন।

কিন্তু তিতুরাম বলল, না মা, আমি মেজমামার সঙ্গে শাস্ত্র শিক্ষা করব।

মা শুনে অবাক। সে কি রে তিতু ? তুই যে পড়াশুনাও বেশীদূর শিখিস নি।

কিন্তু তিতুরাম সেই কথা কানে নিল না। মেজমামা বলল, ঠিক আছে, রোজ দু'ঘণ্টা আমার সামনে বসে থাক্। তোর ধৈর্যটা আগে পরীক্ষা করি পড়াশুনা কি এমনি হয় ? এ দাদার বিয়ে নয়, যে যখন তখন দু' পাঁচটা করলেই হল।

মেজমামা যে রাখহরি মামার ব্যবসার কটাক্ষ করে তিতুরাম তা জানে। মামা টোপর হাতে বাড়ি এলেই মেজমামা বলে, দাদা কটা হল ?

রাখহরি মামা ভাইয়ের কথার উত্তর দেয় না। ভাই যে তার ব্যবসা নিয়ে কটাক্ষ করে সে তা জানে।

একবার কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটেছিল।

দুই ভাইয়ের দক্ষযজ্ঞ লেগে গেল।

এ ওর পুঁথিপত্র নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ও ওর টোপরগুলি কুলুঙ্গি থেকে বের করে ভেঙে চুরে ফেলে দেয়। ঘটনা কি ? ঐ ব্যবসা।

রাখহরি মামা বলল, আমি তোর ব্যবসা নিয়ে কোন কথা বলি ? তুই যে আমার ব্যবসায় নাক গলাবি ?

মেজমামা তাচ্ছিল্যে হেসে বলে, আমার ব্যবসা নিয়ে কিছু বলবে সে তোমার সাহস আছে ? দেখ না কত লোক আমার সম্মান করে ? পণ্ডিত বলে মান্য করে।

আমাকেও অনেক লোক মান্য করে।

তোমায় মান্য করে ? মেজমামা হা হা করে হাসে। তুমি পথ দিয়ে যখন চলো কান কি বন্ধ করে যাও ! লোকে কি বলে শোন না !

কি বলে ?

আমায় বলতে বলছ ? বিয়ে পাগলা মুখুজ্যে বামুন কাকে বলে।

মুখুজ্যে তো তোকে বলে।

আমায় সম্মান করে কথা বলে। আমি এই ঊনবিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

তা এ গ্রামে কেন ? কলকাতায় চলে যা। সেখানে তো বিয়ে ব্যবসা নিয়ে খুব ঘোঁট হচ্ছে। ওখানে গিয়ে দল পাকানা।

পাকাব তো ! তোমরা বামুনদের মুখে চুনকালি দিচ্ছ, তোমাদের ধ্বংস করব না ?

মা এসে এই ঝগড়ার মধ্যে দাঁড়াল বলে সে যাত্রা থেমে গেল।

মা বলল, কি লাগিয়েছ তোমরা দাদা ? একজন অন্তত থেমে যাও।

সেই মেজমামার সামনে দু'ঘণ্টা বসে থাকতে হবে। কিন্তু বসে থাকা সত্যিই মুস্কিল হয়ে পড়ল। দু-চারদিন বসে থাকার পর তিতুরাম বলল, মেজমামা কিছু অন্তত কাজ দাও। শুধু শুধু যে বসে থাকা যায় না।

মেজমামা মুচকি হেসে বলল, কেন আমি শাস্ত্রপাঠ করছি শুনতে পাচ্ছিস না!

তিতুরাম মাথা নাড়ল।

তাহলেই হবে। 'শুঁকে' যেমন অর্ধেক ভোজন হয়, শুনলেও কাজ হবে।

কিন্তু ঐ নীরস অং বং তং শব্দ কিছুই বোঝা যায় না। যে পড়ার মধ্যে কোন রস কষ নেই তা তিতুরামের ভাল লাগে না। ওর চেয়ে ছোটমামার স্বর্ণমঞ্জরী অনেক ভাল।

ছোটমামা আবার শুধু স্বর্ণমঞ্জরীর সঙ্গে পুকুর পাড়ে দেখা করে না। আর একজনকে নতুন দেখল তিতুরাম সে কনকলতা। তিলক গাঙ্গুলীর মেয়ে। কুলরক্ষার বলি হয়ে বাপের বাড়িতে দিন কাটাচ্ছে।

কনকলতাও ছোট মামার সঙ্গে বেশ রঙ্গরস করে। তিতুরাম পাশে দাঁড়ালে বলে তোমার চেহারাটি তো বেশ শক্ত সামর্থ হয়েছে! পুরুষ বলে মনে হচ্ছে।

ছোটমামা মুচকি হেসে বলে, ওকেও কি তোমাব দরকার নাকি কনক? বল তো ব্যবস্থা করে দিই!

কনক ঠোঁট উল্টে বলে, দরকার হলে তোমায় ব্যবস্থা করে দিতে হবে না। আমিই করে নেব। এই বলে তিতুরামের দিকে তাকিয়ে কনকলতা হাসে। বলে, কি গো আমি ঠিক বলছি না?

তিতুরামও হাসে। ওব মনে তখন হেমার জন্যে কষ্ট। হেমা ওর বিয়ে করা বউ। হেমা এতই রেগে গেল যে সেই রাত্রে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

ওর জন্যেই তো তিতুরাম বিয়ে ব্যবসা ছেড়েছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করেছে আর নয়। কিন্তু দুমাস তো হয়ে গেল, কই হেমার কাছ থেকে তো কোন খবর এল না।

মারও যে হেমাকে খুব পছন্দ সেটা একদিন বোঝা গেল। মা বলল, তিতু হেমার বাড়ি থেকে তো কোন খবর এল না। মা শুনেছিল হেমার সেদিনের কাণ্ড। সেইজন্যে বোধহয় বেদনাও বোধ করত।

তিতুরামও চাইছিল হেমার কাছ থেকে ডাক আসুক। ও তো আর বিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে না। আবার এও ভাবে সে, অহঙ্কারই বা হেমার কি? কুলীনের মেয়ে, কুলরক্ষার বলি হয়েই তো সবাই পার হচ্ছে।

এই সময়ে একদিন রাখহরি মামা এসে বলল, তিতু, খুব ফার্স্ট ক্লাস একখানা বিয়ে। খরচপত্তর খুব ভাল দেবে। দেওড়াগ্রামও বেশী দূরে নয়।

কথাটা খুব চুপি চুপি হচ্ছিল। মা কোথায় ছিল, এসে বলল, দাদা আর তিতুকে ঐ বিয়ে ব্যবসার মধ্যে জড়িও না।

তাহলে কি করবে? কুড়ি বছরের দামড়া কি বসে বসে গিলবে? মামা দারুণ রেগে গেল। মার সামনে দিয়ে দুমদাম শব্দ করে বেরিয়ে গেল।

মা মনে খুব ব্যথা পেল। সারা জীবন স্বামীর অবহেলায় ভাইদের বাড়িতে পড়ে থাকতে হচ্ছে। তার ওপর কেউ কথা বললে মা আর সহ্য করতে পারেনা। মা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, তিতু, তুই এত বড় হয়েছিস, কিছু কি উপায় করতে পারিস না! না হয় লোকের ক্ষেতে জনমজুর খাট।

তিতু সেই জন মজুব খাটার জন্যে পথে বেরিয়ে পড়ল কিন্তু জন মজুব খাটার জন্যেও যে একটা তদ্বির দবকার, সেটা তিতুর জানা ছিল না। তাছাড়া কার সঙ্গে আলাপ আছে তিতুর? আর যার সঙ্গে আলাপ আছে, সে হেসে উড়িয়ে দেয়। তুমি বামুনের ছেলে! জন মজুর খাটবে কি?

তিতুরাম সেজমামাকে ধবল, সেজমামা, আমাকে কোন কাজ করে দাও না।

সেজমামা বলল, চল। সেজমামা তিতুরামকে একটা মুদির দোকানে হিসাবের কাজে বসিয়ে দিল। তিতুরাম যেটুকু লেখাপড়া জানত সে বিদ্যায় কুলোলো না। একদিন এমন একটা ভুল করে বসল, মালিক তো এই মারে কি সেই মারে?

তিতুরাম বাখহবি মামাকে এসে বলল, মামা সেই বিয়েটা কি এখনও আছে?

বাখহরি মামা বলল, কোন্ বিয়েটা?

তিতুরাম একটু লজ্জা পেযে গেল, ঐ যে দেওড়া গ্রামে, অর্থশালীব মেয়ে। খরচ পত্তর ভাল দেবে।

বাখহরি মামা গুম হয়ে গেল। বলল, সে খোঁজের দরকার কি? তোব মা তো তোকে ভাল মানুষ কবতে চায।

মায়েব কথায় তিতুরামের খুব রাগ হয়ে যায়। মা যে কত দুঃখী তিতুরাম জানে। সেই মাকে কেউ কিছু বললে তিতুরাম সহ্য করতে পারে না। সেই জন্যে মামার কথাব উত্তরে বলল, মা তো আমার ভাল চায়।

তা আমি কি তোর খারাপ চাই?

তখন আর সেই নিয়ে কোন কথা হল না।

আবাব ফুরসৎ পেতে তিতুবাম সেই কথা তুলল। মামা বলল, সে কি আর বসে আছে? হলধবের মেজ ছেলে বলরাম সে বিয়ে করে ফেলেছে। খরচ পত্তরও ভাল পেযেছে।

আর কোন বিযে তোমার হাতে আসছে না?

তুই করবি? তাহলে ধর্মে মতি হয়েছে? মামা খুব খুশি হল। এবং দু চারদিনের মধ্যে আর একটা খোঁজ আনল। ঐ দেওড়া গ্রামে কুড়ারাম মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সত্যভামা। তবে অবস্থা খুব ভাল নয়। বিয়ের খবচ পত্তর দেবে কিন্তু পরে জামাই আনতে পারবে না।

তিতুরামও রাত্রিবাসের জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। আর সত্যভামার তো কথা নেই।

বিয়ের জিনিস পত্তর নিয়ে রাত্রিবেলা ফিরতে ফিরতে রাখহরি মামা বলল, দেখলি মেয়ে আর মেয়ের বাবা কথাটি বলল না। ওদের যে আমি আগেই শাসিয়েছি। রাত্রিবাসের ইচ্ছা জানালে খরচ কিন্তু ভালই দিতে হবে।

তিতুরাম চুপ করে রইল কিন্তু চোখে তখন ভাসছিল সত্যভামার মুখখানি। বড় কষ্ট হচ্ছিল তার। বাপের টাকা নেই বলে সদ্য পাওয়া স্বামীকে একটি কথাও বলতে পারল না। দুনিয়ায় যে অর্থটাই সব সেকথা তিতুরাম ঐ বয়েসেই দেখেছিল। অর্থ থাকলে কি ঐ মেয়েগুলো কুলরক্ষার বলি হয়? অবশ্য কুলীনদের রীতিনীতিই এই চলছে। বাপ হয়ত দশ পাঁচটা বিয়ে করে ফেলল। পয়সা আছে বলে বাড়িতেও সেই বৌগুলোকে এনে রাখল কিন্তু মেয়ের কুলরক্ষা করে বিধবাদের মত বসিয়ে রাখল।

মেয়ে যদি বলে, আমি কি শ্বশুর বাড়ি যাব না?

বাবা বলে, সেখানে গিয়ে কি করবি?

শোন বাপের কথা। মেয়ে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে কি করবে?

অতি বড় মুখরা মেয়েও বলতে পারত না, বাবা, তুমি দশটা মাকে নিয়ে সুখে আছ, আমার কথা কি তোমার মাথায় একবারও আসে না?

মামা ভাগনে দুজনে সন্ধ্যেবেলা দেওড়া গ্রাম থেকে বেরিয়েছিল। বেশি রাত হয় নি। হঠাৎ খানিকটা চলার পর তিতুরাম দাঁড়িয়ে পড়ল।

মামা বলল, কি হল? দাঁড়িয়ে পড়লি কেন?

তিতুরাম বলল, মামা জিনিসপত্তরগুলি নিয়ে তুমি চলে যাও, আমি পরে যাচ্ছি।

মামা বলল, কেন তুই কোথায় যাবি?

মামাকে যদি এখন হেমাঙ্গিনীর কথা বলে তাহলে মামা দারুণ চটে উঠবে, তাই বলল, তুমি যাও না, আমার একটু দরকার আছে। এই বলে মামার হাতে জিনিসগুলি দিয়ে তিতুরাম হন হন করে অন্য রাস্তায় চলে গেল।

আজ এসব কথা তিতুরামের মনে পড়ছে। ও একটু থমকে দাঁড়াল। অনেক পথ হেঁটেছে, গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। দ্রুত হেঁটে আসার জন্যে এই অবস্থা। এখন আর রোদ নেই। তাই গামছাটা মাথা থেকে নামিয়ে তিতুরাম পুঁটলির মধ্যে ঢোকাল।

আসলে মানুষ যেটা চায় সেটা বুঝি মানুষ পায় না। এই এত বছর পর এইটুকু অভিজ্ঞতা তিতুরামের হয়েছে। তিতুরাম কি চেয়েছিল, সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে শ্বশুর বাড়িতে হাজিরা দিয়ে যাবে?

বাখহরি মামার দোষ দেওয়া যায় না। এ ভবিতব্য। এই তাকে করতে হবে। এইজন্যে যেন সৃষ্টিকর্তা তাকে পাঠিয়েছে। এই না হয়ে সে যদি অন্য রকম হয়ে যেত তাহলে বুঝি অবাক হত, বয়েস একটু বেশি হলেই সে বুঝতে পেরেছিল। যতই সে অন্যরকম হবার চেষ্টা করুক, তাকে যা হবার জন্যে পাঠানো হয়েছে, জন্মের পর যেন তার কপালে তা লেখা হয়ে গেছে।

যখন তেতাল্লিশ বছর বয়স। একবার খুব বিপদে পড়েছিল। নতুন বিয়ে। খবব এসেছে যেতে হবে। সেদিন খুব জ্বর ছিল।

মা বলল, তিতু আজ বেরোস না। একটা কিছু যদি হয়ে যায় তাহলে তাল সামলাতে পারবি না।

লোভেরও তো একটা সীমা আছে। বিয়ে মানে অনেক টাকা। তারপর দান সামগ্রী, বাসন পত্তর নতুন কাপড় গামছা সংসারেরও অনেক জিনিস এসে যায়! তিতুরাম লোভ সামলাতে পারল না।

অথচ গায়ে একশ' মত জ্বর। তখন চুনিলালের মেয়ে কালিন্দী ঘরে আছে। ওব বাবা অবস্থাপন্ন লোক। খরচ না দিলে অবশ্য শ্বশুর বাড়িতে রাখার কোন রীতি নেই। সবই তো অর্থের স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর নিয়ম অনিয়ম নির্ভর করে।

তেমনি এক পুঁটুলি টাকা সঙ্গে নিয়েই কালিন্দী স্বামীর ঘর করতে এসেছিল।

সেই কালিন্দী মাথায় ঘোমটা দিয়ে বাইরে এসে বলল, মা ওঁকে বারণ কর না। রাস্তায় যদি ঘুরে পড়ে যায়।

মা বলল, আমি তো বললুম শুনছে কই? তুমি একটু বলো না।

কালিন্দী একটু এগিয়ে এসে বলল, কি গো শুনতে পাচ্ছ না? পথে যদি ঘুরে পড়ে যাও তাহলে কে দেখবে? তুমি তো উঠে বসতে পারছিলে না।

কিন্তু তিতুরাম মা, বৌ কারও কথাই কানে নিল না। ভবিতব্য বলে কথা। সেদিন যে তিতুরামের কপালে দুর্ভোগ লেখা ছিল কে খণ্ডাবে?

ওর বাড়ি থেকে বিবাহের স্থান বেশ কয়েক ক্রোশ দূর। সেই পথ তিতুরাম ঐ একশ' ডিগ্রী জ্বর নিয়েই এগিয়ে চলল। ঐ যে ওকে মা-বৌ নিষেধ করেছে। মানুষের আর একটা স্বভাব আছে না, যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়, সেই কাজই করতে ইচ্ছে হয়।

তিতুরাম জ্বর গায়েই কয়েক ক্রোশ পথ লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে পৌঁছল, কিন্তু বিয়ে বাড়ির সামনে আসতে দেখে বেজায় ভীড়! কি ব্যাপার?

কিন্তু তিতুরামের শোনার অপেক্ষা হল না। কে যেন বলল, এই তো বর। এ রমলার কুলরক্ষা করতে এসেছে। আর যায় কোথায়? মার মার। পিঠে শুধু তিতুরামের লাঠির বাড়ি পড়তে লাগল।

তিতুরাম বলল, তোমরা আমায় মারছ কেন? আমি কি করেছি?

কে যেন বলল, কত বিয়ে করেছ বল তো গোপাল ! আর বিয়ে করবে ? দেশের লোকগুলো হয়েছে ভেড়া। বামুনদের মেয়েগুলোকে ধরে ধরে জলে ডুবিয়ে মারছে।

তিতুরাম বলল, বেশত বাবা, বিয়ে তো আমি করতে চাই নি। আমার তো ঘটক দিয়ে সম্বন্ধ করা হয়েছিল। আমি না হয় চলে যাচ্ছি। তোমরা বিয়ে দিও না।

জনতা বলল, তোমায় যাওয়াচ্ছি। মারের চোটে তোমার বিয়ে করার সাধ চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেব।

তিতুরাম বলল, আমায় মারলেই কি বিয়ের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে ?

জনতা বলল, তোমায় দিয়ে শুরু হল। এবার যাকে দেখব তাকে মারব।

কিন্তু মেয়েটার কি হবে। ওকে কে বিয়ে করবে। ওর বাবার তো কুলরক্ষা হবে না।

জনতা ভেংচে বলল, তোমায় ভাবতে হবে না। বাপটাকেও আমরা ঠেঙিয়েছি। এমনি যারা কুলরক্ষার চেষ্টা করবে তাদেরও মার দেওয়া হবে।

এই সময় সর্বত্র কিছু কিছু দল গড়ে উঠছিল। কলকাতায় যখন বিদ্যাসাগর মশাই বহু বিবাহ নিয়ে আন্দোলন করছেন, গ্রামে গ্রামে তার ঢেউ এসে পড়েছিল। এমনি এক দলের বলি হল তিতুরাম গাঙ্গুলী।

কিন্তু ওর তখন গায়ে একশর মত জ্বর। মারের চোটে জ্বর আরও বেড়ে গিয়েছিল। ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, মা চিৎকার করে উঠল, কালিন্দী দেখো, তিতুর কি হয়েছে।

তিতুর তখন মুখে কোন কথা বেরোচ্ছে না। সেই যে দাওয়ার ওপর ধপাস করে উপুড় হয়ে পড়ল, আর কোন চেতনা রইল না। পিঠ, বুক, মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

কালিন্দী এসে স্বামীর অবস্থা দেখে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

মা বলল, এখন কি কাঁদবার সময় ! ওকে ধর, দুজনে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াই।

তাই করল দুজনে।

সেবার তিতুরামের শরীর সারাতে মাসখানেক লেগেছিল। তাই ভবিতব্য যদি না হবে তাহলে তিতুরাম সেদিন মার খাবে কেন।

কই আর তো কখনও কেউ এরকম মার খেল না। বরং ব্রাহ্মণরাই রুখে দাঁড়াল। আমাদের ব্যাপারে মাথা গলালে আমরাও ছেড়ে কথা বলব না। বরং ব্রাহ্মণদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে যারা কেষ্ট-বিষ্টু তাদের মাথা চাড়া দেওয়াতে আন্দোলনটা গ্রামের মধ্যে থেমে গেল।

অর্থাৎ ভয় পেয়ে আবার তারা ইঁদুরের গর্তে সেঁধোল।

বল হরি হরি বল।

নাতিনপুরের শ্মশান পথ। তিতুরাম একটু সরে দাঁড়াল। একটি শব যাত্রা চলেছে। তার পিছনে প্রায় চল্লিশটি মেয়ে। প্রত্যেকের মাথায় ঘোমটা, কেউ আবার ঘোমটা দেয় নি। সজল চোখ। চোখ বেয়ে জল আসবার উপক্রম। কেউ কেউ আবার ডাক ছেড়ে কাঁদছে। ওগো, আমার কি হল গো। তাদের কান্নায় নিস্তব্ধ গ্রাম্য পথ মুখরিত। শবযাত্রাটা কাছে এসে পড়তে তিতুরাম একটু সরে দাঁড়াল। কে গেল হে।

বোঝা তো যাচ্ছে তারই মত কোন বিয়ে ব্যবসার ব্যাপারী। গাঙ্গুলী মশাই যে। তিতুরাম লোকটাকে চিনতে পারল, নবগোপাল। আপনার শ্বশুর মশাই গেল।

শ্বশুরমশাই? তিতুরাম নবগোপালের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, চিনতে পারছেন না? ঐ তো আপনার স্ত্রী সত্যভামা রয়েছে। তিতুরাম চিনতে পারত না, এই কিছুক্ষণ আগে সত্যভামার কথা ভাবছিল বলে চিনতে পারল। তাহলে সত্যভামার বাবা কুড়ারাম গেল। হঠাৎ সত্যভামাকে নিয়ে সেই নবগোপাল এল। গাঙ্গুলী মশাই, আপনার বউ।

সত্যভামাকে চেনা গেল না। তেরো বছরের কিশোরীর এখন চল্লিশের ওপর বয়স হয়েছে। ওকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না এ তিতুরামের বৌ। তিতুরাম অন্যদিকে মুখ ফেরালো। তাছাড়া কুড়ারাম তো একদিনের জন্যেও জামাইকে শ্বশুরবাড়ি আনে নি। সত্যভামার বিয়ের সময়ে মুখ ছিল বিষণ্ণ। আজ সেসব ছিল না, শুধু বাবার জন্যে চোখে জল। তাছাড়া চেহারাটিও ভাল হয়েছে। তেরো বছরের অপুষ্ট চেহারা আর ছিল না। সে জায়গায় ভারি, স্থূলাকৃতি। বড় মুখ, চওড়া কপাল, সীমন্তে চওড়া করে সিঁদুর।

সত্যভামা তিতুরামের সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। ও, ও বোধহয় চিনতে পারছিল না। নবগোপাল বলল, সত্য, তোমার বর।

অমনি ঢিপ করে গলায় আঁচল দিয়ে সত্যভামা প্রণাম করল। তিতুরামকে পৈতে বের করে আশীর্বাদ করতে হল।

কি হয়েছিল? তিতুরাম নবগোপালকে জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর দিল সত্যভামা। বাবার অনেক ব্যাধি। মরেছে ভাল হয়েছে।

তিতুরাম সত্যভামার দিকে তাকাল। গলাতে মিষ্টতা কম। সঙ্গের লোকটি কে? যার নাম নবগোপাল। তিতুরাম অবশ্য জানে, ওর একটা মুদির দোকান আছে। আর সে হল দেওড়াগ্রামে।

নবগোপাল বলল, নাও সত্য খুব যে বলো স্বামীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই না, দিলুম তো। হেঃ হেঃ এখন আমার মুরোদ আছে কিনা দেখলে তো!

মুরোদ ? তিতুরাম একটু হোঁচট খেল। তাহলে নবগোপালের সঙ্গে সত্যভামার এই সব কথা হয় ? কিন্তু এত বছর ধরে সত্যভামা তাকে মনে রেখেছে কেন ? স্বামী ! স্বামী তো একদিন শুধু পুরুতের সামনে বিয়ের মন্ত্র পড়েছিল। রাত্রিবাস তো কোনদিনও করে নি।

সত্যভামা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, আমাদের বাড়িতে যাবে না !

দেখা যখন পেয়েছে তখন যান যান গাঙ্গুলী মশাই। খরচ যা লাগে তা আমি দেব।

তুমি দেবার কে হে ? তুমি কে ? কিন্তু বলা গেল না। সব কথা সব সময়ে বলা যায় না বলে মনে মনে তিতুরাম একটু বিরক্ত হল। বরং সে অন্য ওজোর আপত্তি তুলল, এখন তো সম্ভব নয়। বৈঁচী গ্রামে যাচ্ছি। ফেরবার পথে না হয়—

হঠাৎ সত্যভামা পথের ওপর বসে পড়ে তিতুরামের পা দুটি জড়িয়ে ধরল।

না গেলে আমি এখুনি মাথা কুটে মরব।

নবগোপাল বলল, যান, যান গাঙ্গুলী মশাই। আবার কবে দেহ রাখেন। স্ত্রীর সাধ পূরণ করুন।

তুমি কে হে বাপু ? প্রথম থেকে ইন্ধন যোগাচ্ছ ! কিন্তু এও বলা গেল না। শুধু কটমট করে ওর দিকে তাকাতে হল।

তিতুরাম মেজাজটা ঠাণ্ডা করে বলল, সত্যভামা শোন, আমি কথা দিচ্ছি, ফেরবাব পথে তোমার বাড়িতে একদিন থেকে যাব।

না, আর দেখা পাব না।

তিতুরাম বলল, আমি কথা দিচ্ছি।

তবু সত্যভামা সেই পথের ওপর পা দুটি জড়িয়ে বসে থাকল।

তিতুরাম বলল, তোমার বাবা দেহ রেখেছেন। তোমার তো কিছু ক্রিয়াকর্ম আছে।

সত্যভামা বলল, সে মা-রা রয়েছেন। আমার এতে কি করার আছে ?

অগত্যা তিতুরামকে সত্যভামার সঙ্গে যেতে হল। যদিও অবলাকে কিছু বোঝানো যেত কিন্তু সঙ্গে ঐ ফেউ নবগোপাল। নবগোপাল অন্য পথ ধরে চিৎকার করে বলল, সত্য, তুমি গাঙ্গুলীমশাইকে বাড়ি নিয়ে যাও, আমি কাজকর্ম সেরে যাচ্ছি।

লোকটি কে ? সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছে হল তিতুরামের। কিন্তু এই ভেবে জিজ্ঞাসা করল না, কি হবে কেঁচো খুঁড়ে ?

দাওয়ায় বসিয়ে সত্যভামা দ্রুতপায়ে ঘরে চলে গেল। আবার দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, একটু বসো আজ যে আমি কত ভাগ্য করেছি।

বাড়িতে কোথাও কোন লোক দেখা যাচ্ছে না। ওপাশে গোয়াল ঘরে দুটো হাড় জিরজিরে গরু মুখ দিয়ে গ্যাজলা বের করে এপাশে তাকিয়ে আছে। তিতুরাম বলল, সত্য আজ থাক। তোমার বাবা আজ মারা গেছে। আমি কথা দিচ্ছি অন্য একদিন আসব।

না, তুমি একটু বসো। আমি তোমার জন্যে কিছু খাবার করি। সত্যভামা কথা না বাড়িয়ে আবার দ্রুত চলে গেল।

তিতুরাম একান্ত নির্জীবের মত বসে রইল। অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছে বৈঁচী গ্রাম এখান থেকে এক ক্রোশ পথ। তিতুরাম আবার রাত্রিবেলা চোখে ভাল দেখতে পায় না। শেষ পর্যন্ত বিয়ে বাড়িতে সে পেঁছিতে পারবে কিনা বুঝতে পারছে না। এত পথে বাধা পড়লে কি কোন কাজে এগোনো যায়?

কিন্তু এই সব মেয়েগুলোকে যে ব্যথা দিতে ভীষণ কষ্ট হয়? মায়ের মুখ যে তিতুরাম ভুলতে পারে না। মা যে সারাজীবন এই মেয়ে হয়েই নির্যাতন ভোগ করে গেছে।

মা বলত, তিতু, আমি চাই নি তুই এই বিয়ের ব্যবসা করিস। তা যখন শুনলি না, অন্তত মেয়েগুলোর মুখের দিকে একবার তাকাস। ওরা যে অভিশপ্ত তা তো বুঝতে পারিস? অনেক কথা তারা বলতে চায় কিন্তু বলতে পারে না। ওদের ওই চুপ করে থাকা যে সর্বনাশের কারণ।

তিতুরাম দেখেছিল, মা সারাজীবন ভাইদের সংসারে পড়ে রইল। চারটে ভাই চার রকম। চারজনের নানা বায়নাক্কা। মার কি কম ঝামেলা?

কোন ভাই মার দিকে তাকায় না। বড় ভাই বিয়ে করে করে শুধু টোপর গাদা করছে কুলঙ্গীতে। আর সে সব মাকেই গুছিয়ে রাখতে হচ্ছে।

মা যদি বলল, দাদা, আর বিয়ে কেন? অনেক তো হল। এবার শ্বশুর বাড়িগুলোতে যাওয়া আসা কর। তাহলেই তোমার সারাজীবন কেটে যাবে।

অমনি বড় ভাই চটে লাল। গিরি, তুই যেমন মেয়েছেলের মত আছিস মেয়েছেলের মত থাকবি। কথা বলার তোর কি দরকার?

মা শুনে থ। মেজো ভাইও তেমনি। দিনরাত পণ্ডিতদের এনে বাড়ি গুলজার করছে! আর শাস্ত্র আওড়ানোয় কান পাতা যায় না।

মা যদি বলল, মেজদা, এসব ছেড়ে দিয়ে একটা কাজকর্ম দেখে বিয়ে-থা কর।

ভাল কথা। অভিভাবকের মত সদুপদেশ শুনে মেজদাও চটে লাল। আমার এসব কি তোমার ভাল লাগে না! আমি তো কারও ক্ষতি করি নি।

মা বলল, তা কি বলছি আমি। মা ঢোক গিলল, আমি আর কদিন তোদের সংসার করব। আমারও তো শরীর আছে। তাছাড়া তুই বিয়ে করবি না কেন?

মেজভাই হা হা করে হেসে বলে, কেন বিয়ে করার সাধ কি তোমার মিটছে না। দাদা তো গণ্ডা গণ্ডা করে চলেছে। ঐ দাদাকেই বল না, একটা বৌদিকে বাড়ি আনতে। না হয় আমরা তিনভাই তার খরচ দেব।

মা সে সব কথায় আর উত্তর দেয় না। শেষে কি বড় ভাইকে বলে একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধাবে ?

মা শুধু নীরবে ভাইদের সংসারে হেঁসেল নিয়েই থেকে যায়। আর তিতুরাম দেখেছে মায়ের মুখে বেদনার ছায়া। মা যেন আর পারছে না। অথচ বলার কিছু নেই। তাহলেই চার ভাই মার মার করে ছুটে আসবে।

যগু অর্থাৎ মেজ মামা একটু মাযের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। মায়েব জন্যে কতদিন ভাঁড়ে করে দই নিয়ে এসেছে।

মা বলেছে, যগু এটা কি ?

যগু বলেছে, দই।

মা বলেছে, দই কি হবে যগু ?

যগু বলেছে, কেন তুমি খাবে ?

মা আর জবাব দিতে পারে নি। চোখ দুটি জলে ভরে গেছে। মায়েব জন্যে অন্তত একজনও যে একটু সহানুভূতি দেখায় মা যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

তাই তিতুরাম যতই বিয়ে ব্যবসা করুক, মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা খেলুক, যতদূর পারে মেয়েদের দুঃখ দেয় না।

এই যে সত্যভামা তাকে পথ থেকে নিয়ে এল। ও কি ইচ্ছে করলে সত্যভামাকে আঘাত দিয়ে চলে যেতে পারত না ?

নবগোপাল এই সময় এসে পড়ল, ডাকল, সত্য, সত্য ! নবগোপালের হাতে একখানি নতুন ধুতি, গামছা, একটা বড় ভাঁড়। ভাঁড়ে যেন কি ? আর এক গোছা টাকা সত্যের হাতে দিয়ে বলল, নাও, ভাল করে স্বামী পুজো কর। আমার দোকানটা আবার খালি রয়েছে, আমি চললাম।

নবগোপাল চলে গেল। আর সেই দিকে তিতুরাম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই যুবকগুলি যেন এ যুগে নতুনভাবে জন্ম নিয়েছে। এরা না থাকলে বোধ হয় এই অভাগী মেয়েগুলির কোথাও স্থান হত না।

সমাজের চোখে হযত এরা খারাপ বলে প্রমাণিত হয় কিন্তু এরা না থাকলে এই মেয়েগুলির কি হত ?

সত্যভামা ডাকতে এল, চল।

তিতুরাম ঘরে গিয়ে দেখল, আহারের ব্যবস্থ্য হয়েছে রাজসিক। সামনে একটা নতুন আসন।

বসো।

তিতুরাম বসে পড়ে বলল, তোমার বাবা মারা গেছে, এ সময়ে এ সব না করলেও চলত।

সত্যভামা সামনে বসে একটা পাখা দিয়ে হাওয়া করতে করতে বলল, বাবা তো আর ফিরবে না। তোমার দেখা পেয়েছি, তোমারও তো আর দেখা পাব না।

তিতুরাম বলল, আমি তো তোমায় বললাম আর একদিন আসব।

সত্যভামা চুপ। তিতুরাম কিছু খেল কিছু খেল না। সত্যভামা বলল, ওসব ফেলে রাখছ কেন? রান্না কি ভাল হয় নি?

তিতুরাম বলল, তা কেন? রান্না তো খুবই ভাল হয়েছে।

তবে?

তিতুরাম কথাটা বলতে একটু ইতস্তত করছিল। বলেই ফেলল, আমায় তো সব দিয়ে দিলে, তোমার জন্যে কিছু কি থাকল?

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে সত্যভামা অন্যত্র চলে গেল। কানে গেল কান্নার শব্দ। এই সব মেয়েরা যে কি কষ্ট করে জীবন চালায়? মায়ের কথা তিতুরামের মনে পড়ে। মা বলেছিল, পারিস্ তো মেয়েদের কষ্ট দিস না। ওদের মুখের দিকে তাকাস।

তিতুরাম ঠিক করল এই অভাগিনী মেয়ের বাড়িতেই আজ রাত্রিটা কাটিয়ে যাবে। একটা বিয়ের আয় ফাঁক যাবে বটে। ক্ষতি। কিন্তু এই মেয়েটিকে তো খুশি করা যাবে! এই বলে তিতুরাম হাত মুখ ধুয়ে এসে সত্যভামার বিছানার ওপর উঠে বসল।

কিছুক্ষণ পরে সত্যভামা এল। নবগোপালের দেওয়া কাপড়, গামছা মিষ্টি ও টাকা এগিয়ে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে পায়ে প্রণাম করল, বলল, পারলে মাঝে মাঝে এস। বাবা তো মারা গেল দেখছ, মা-রা কেউ থাকে না। আমি একা।

তিতুরাম বলল, আমি তো এখুনি যাব বলে বসি নি। আজ রাত্রে আমি এখানে থাকব।

সত্যভামা কুণ্ঠিতস্বরে বলল, কিন্তু রাত্রে থাকার খরচ তো আমি দিতে পারব না।

তিতুরাম হেসে বলল, তোমায় কিছুই দিতে হবে না। আর এই যে কাপড়, গামছা, টাকা তুমি নবগোপালকে ফেরৎ দিও।

সত্যভামার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল; কোন কথা বলল না। আর তিতুরাম এই অভাগী মেয়ের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওদের যেন তিতুরাম সেই জ্ঞান হওয়ার পর থেকে চিনেছে। আজীবন এরা নিরবে নির্যাতিতা হয় কিন্তু কখনও মুখ তুলে প্রতিবাদ করে না। তার সাক্ষী তো ঐ তিতুরামের মা। মা কি কখনও প্রতিবাদ করেছিল?

তিতুরাম বলল, কি হল দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

সত্যভামা বলল, না আজ তুমি যাও। তোমার কাজের ক্ষতি হয়ে যাবে?

তিতুরাম অবাক, বলল, আমি বলছি থাকব, তা সত্ত্বেও তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?

সত্যভামা বলল, তাড়িয়ে দিচ্ছি বলো না। আজ তোমার কাজ। যেদিন কাজ থাকবে না এস।

এই মেয়ে ত্রিশ বছর স্বামীর মুখ দেখে নি। এও মেয়ে, সৌদামিনীও মেয়ে। তিতুরাম পথে এসে নামল।

যুগে যুগে মেয়েরা নির্যাতিতই হয়ে আসছে; কখনও মেয়েরা মাথা তুলে কথা বলে না। উনবিংশ শতকে বাংলার গ্রামে গ্রামে কুলরক্ষার বলি হয়ে ব্রাহ্মণ কন্যারা নীরবে নিজেদের বলি দিচ্ছে। কলকাতায় বসে বিদ্যাসাগর মশাইরা যতই বহু বিবাহ নিয়ে লিখুন, মেয়েদেব জন্যে যতই সমবেদনা দেখান, গ্রামের মধ্যে মেয়েদের কোনই উপকাব হচ্ছে না। তারা যেন সব আন্দোলনের বাইরে, সব বিদ্রোহের বাইবে। তার সাক্ষী এই সত্যভামা, অনুসূয়া, বকুলবালা; তারা স্বামীর প্রয়োজনে কখনও স্বামীকে আটকে রাখে না। তিতুরামও সেই কথা ভাবছিল, এই দেশে যেমন সৌদামিনী, সোনামণি আছে, তারা স্বামীকে পেলে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকে রাখে, আবার সত্যভামা, অনুসূয়া বকুলবালাবাও আছে।

সত্যভামার ঘটনা তো স্বচক্ষে দেখা গেল। এমনি অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে অনুসূয়াও ছিল।

বার বার চিঠি দিয়ে যখন তিতুরাম কিছুতে সময় করতে পারছিল না, একদিন কি ভেবে অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির।

অনুকূল বলল, একি জামাইবাবা যে, কি খবর? পথ ভুলে নাকি?

তিতুরাম লজ্জিত হল, বলল না একদম সময় পাই না। অনেকগুলি চিঠি গেছলো!

ওদিকে তখন বাড়ির মধ্যে খবর চলে গেছে। জামাই আদরের জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। পুকুরের মাছ গোয়ালের গরুর দুধ।

ও গোয়ালা, আমাদের গরু পাঁচ মাস গাভিন। একটু দুধ দিতে পারবে না?

গোয়ালা বলল, আমি যে সব দুধ বেচে দিয়েছি কর্তাবাবু। তা এখন দুধের কি দরকার?

অনুকূল বলল, জামাই এসেছে। দুধ না হলে তাকে কি দিয়ে খাতির করব বলো? জান তো জামাইদের খুব কষ্ট করে আনতে হয়।

গোয়ালা বলল, ঠিক আছে। কাউকে পাঠিয়ে দেন। নতুন গরুটা থেকে দুয়ে দিই। একটু দুধ পাতলা হলে তো ক্ষতি হবে না ?

অনুসূয়ার ভাই পরমেশ্বর চলে গেল গোয়ালার কাছ থেকে দুধ আনতে। তেমনি দুধ, মাছ মিষ্টি সব আনা হল। জামাইকে আসন পেতে দিয়ে খাতির করে খাওয়ানো হল।

তারপর বিশ্রামের জন্যে আলাদা একটি ঘরে বিছানা পেতে দেওয়া হল। অনুসূয়া এল অনেক পরে। অনুসূয়ার মুখ একটু থমথমে। অনুসূয়া কি কাঁদছিল ? তিতুরাম ঠিক বুঝতে পারল না।

এ কি তুমি কাঁদছিলে নাকি ?

অনুসূয়া বিছানার এক পাশে বসে বলল, না তুমি এলে কেন ?

তিতুরাম অবাক। কেন আমি আসাতে তুমি খুশি হও নি ?

অনুসূয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। তিতুরাম জিগ্যেস করল, কেন খুশি হও নি ? অনেকবার চিঠি গেছল, আমি একদম সময় পাই নি।

অনুসূয়া বলল, কাজ তো তোমার শ্বশুরবাড়ি ঘোরা। আমাদের এটা কি শ্বশুরবাড়ি নয় ?

তিতুরাম চুপ করে রইল, কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। অনুসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, সে মুখে যেন একটা দৃঢ়সঙ্কল্পের ছায়া। বিয়ের পর এই প্রথম এ বাড়িতে আসছে। আগে অনুসূয়ার বয়স কম ছিল, এখন বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে।

তিতুরাম বলল, কই কাছে এস, দূরে দূরে থাকলে কি ভাল লাগে।

অনুসূয়া বলল, নিজেকে খুব ঘৃণ্য মনে হয় ; ওর চেয়ে আমার মৃত্যু হলেই ভাল হত।

তিতুরাম বলল, এসব কথা বলছ কেন ? ডেকেছিলে, এসেছি।

অনুসূয়া বলল, আমি তো ডাকি নি। বাবা-মাই আমার বলির জন্যে উদব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বিয়েওলা মেয়ের এখনও জামাইয়ের সঙ্গ ঘটে নি।

অনুসূয়া এমন করে হেসে উঠল তিতুরাম একটু মুষড়ে পড়ল। অন্য মেয়েদের মত সে স্বামী সঙ্গের জন্যে উদগ্রীব নয়। মনে মনে তিতুরাম একটু ঘাবড়ে গেল। ডাকল, কই এস ?

অনুসূয়া বলল, না।

তিতুরাম এই সব মেয়েদের কি করে কাছে আনতে হয় জানে। বিছানার ওপর উঠে বসে হাত ধরে টানল, আর সঙ্গে সঙ্গে অনুসূয়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অনুসূয়া বলল, তুমি চলে যাও।

তিতুরাম বলল, কেন ?

অনুসূয়া বলল, তোমার কাছে নিজেকে স'পে দিতে আমার খুব ঘৃণা লাগছে।

কেন, কেন ? তিতুরাম বেশ চটে উঠল।

অনুসূয়া বলল, যখনই মনে হয়, তুমি অনেকের। অনেক মেয়ের তুমি স্বামী। তার মধ্যে আমি একজন।

তিতুরাম বলল, তাতে কি হয়েছে ? সব মেয়েই তো এইভাবে আমার সঙ্গ নিয়েছে।

আমি সেই সব মেয়ে নই। সেই জন্যে তো আমার বড্ড ঘৃণা লাগছে।

তিতুরাম তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে অনুসূয়ার দিকে। কত বয়স হবে মেয়েটির ? চোদ্দ অথবা পনেরো। এই বয়সে কি অদ্ভুতভাবে নিজেকে বুঝে নিয়েছে। এ বুঝি মেয়েদের দ্বারাই সম্ভব।

তিতুরাম তখন অন্য পন্থা নিল। কোমল কণ্ঠে বলল, অনুসূয়া বসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? আজ তো আমি তোমার। আজ আর তো আমি কারও নই। আমি বুঝতে পেরেছি, অনেকগুলো চিঠি গেছল, আমি আসি নি বলে অভিমান হয়েছে।

কিন্তু অনুসূয়া দাঁড়াল না। দরজার খিল খুলে বাইরে এসে যেতে যেতে বলল, সারাজীবন কুমারী হয়ে থাকব তবু তোমার মত স্বামীসঙ্গ আমি চাই না।

তিতুরাম চিৎকার করে ডাকল, অনুসূয়া শুনে যাও। পরে হয়ত এই সব কথা ভেবে কষ্ট পাবে।

অনুকূল শুনে বলল, সেকি অনু এমন কথা বললো।

অনুকূলও ছুটল মেয়েকে ফেরাতে কিন্তু ফিরে এসে বল্‌ল, না রাজী করানো গেল না। মেয়েটা বড় এক গুঁয়ে। হাপুস নয়নে কাঁদছে তবু এল না।

নারীচরিত্র জীবনে তিতুরাম কম দেখল এমন নয়। স্বামী মিলনের জন্যে উদগ্রীব মেয়েও দেখেছে, আবার স্বামীকে চায় না, এমন মেয়েও দেখেছে। স্বামীকে চায় না এই সব মেয়েদের দেখে তিতুরাম অবাক হয়। ওরা কি জানে না, স্বামী ছাড়া মেয়েদের একদিকের সব চাওয়া পাওয়া অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

এমনি হেমাঙ্গিনীর মধ্যেও দেখেছিল। সেদিন মামাকে বাড়ি পাঠিয়ে তিতুরাম শিবনাথের দরজায় গিয়ে কড়া নেড়েছিল।

রাত্রি বেশি হয় নি। তবু পাড়াগাঁয়ের রাত্রি তো। গ্রাম নিশুতি হয়ে গেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ভেতর থেকে সাড়া এল, কে ?

তিতুরাম বলল, আমি তিতুরাম।

শিবনাথ দরজা খুলে বলল, এত রাত্রে ?

তিতুরাম লজ্জিত হয়ে পড়ল, এত রাত্রে আসা বোধ হয় ঠিক হয় নি। লজ্জিত হয়েই বলল, এই এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম।

শিবনাথ তখন চিৎকার করে বাড়ি জাগাচ্ছে। হেমাঙ্গিনীকেও কে যেন ঠ্যালা দিয়ে তোলবার চেষ্টা করল এই হেমা, ওঠ ওঠ ! দেখ কে এসেছে ?

শিবনাথ বলল, তিতু তোমার খাবার ব্যবস্থা করি ?

তিতুরাম বলল, না, না, আমি খেয়ে এসেছি। দেওড়াগ্রামে একটা নেমন্তন্ন ছিল।

হেমাঙ্গিনী কোনই সাজগোজ করে নি। অনেকেই তাকে বলেছিল জামাই এসেছে অন্তত কাপড়টা পালটে চুল একটু আঁচড়ে নে। হেমাঙ্গিনী সে সব ভ্রূক্ষেপ করে নি।

হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে যখন তিতুরামের দেখা হল, হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার ? তাড়িয়ে দিলুম, আবার এলে !

তিতুরাম হাসতে হাসতে বলল, কেউ কেউ তাড়িয়ে দিলেও আসতে ইচ্ছে করে।

হেমাঙ্গিনী কোন কথা বললো না ! চুপ করে বসে রইল ! তিতুরাম বলল, চুলটা একটু আঁচড়ে এলে না ? কেমন যেন পাগল পাগল দেখতে লাগছে। চুলটা আঁচড়ে, মুখটা পরিষ্কার করে ভাল একটা কাপড় পরে এস।

হেমাঙ্গিনী বলল, কেন ?

তিতুরাম হাসতে হাসতে বলল, বাহ্, আমি এসেছি। আমি তোমার বর। তোমাকে সুন্দর দেখতে ইচ্ছে করে না !

হেমাঙ্গিনী তবু চুপ করে বসে রইল। ওর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, ও এসব শুনতে চাইছে না। অনুমানও মিথ্যে নয়। হঠাৎ বলল, কোত্থেকে এলে ? বাবাকে তো বলেছ দেওড়াগ্রামে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে। কিসের নেমন্তন্ন ?

দূর থেকে যেন একটা হৈ-হল্লা ভেসে আসছে। তিতুরাম আবার ভাল চোখে দেখতে পায় না। বৈঁচী গ্রাম এসে গেছে সেটা তিতুরাম বুঝতে পারছে। পথটা বেশ অন্ধকার। আজ আকাশে একটা তারাও ফোটে নি। বৃষ্টি হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আকাশটা বেশ থমথমে। ঈশান কোণে মেঘ জমছে ! গুমোট ভাবটা বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। প্রায় দৌড়ে এসেছে তিতুরাম। কপাল, বুক দিয়ে

ঘাম ঝরছে। সত্যভামা যদি ছেড়ে না দিত তাহলে আর বৈঁচী গ্রামে এসে এই বিয়েটা সারা যেত না।

সৌদামিনীর কথা মনে পড়ে। এখনও বিয়ে তুমি করছ? আর কত বিয়ে করবে? বিয়ের সাধ কি মিটছে না? তিতুরাম তখন ভাল করে কথাটার জবাব দিতে পারে নি।

সৌদামিনী কি করে জানবে কেন তিতুরাম এখনও বিয়ে করছে? ব্যবসাদার যখন ব্যবসা করে তখন কি ব্যবসাদার তার ব্যবসা ছেড়ে দেয়? আর সে ব্যবসায় যখন আয় সমান তালে হতে থাকে? তিতুরামও তো ব্যবসাদার।

ওরা ভাবে তিতুরাম, নারী শরীরের প্রতি লালসায় এই ব্যবসাকে চেপে ধরে আছে। কিন্তু সেটা যে ভুল সে কথা হেমাঙ্গিনীকেও বুঝিয়ে বলতে পারে নি।

হেমাঙ্গিনীর যা ধারণা, সব মেয়ের তাই ধারণা—তিতুরামের নারী দেহের ওপর অদম্য লোভ।

হ্যাঁ, তবে বলতে গেলে প্রথম দিকে যে নারী দেহের ওপর লোভ ছিল না, সে কথা তো তিতুরামও অস্বীকার করতে পারবে না। না হলে ঐ রাত্রে দেওড়া গ্রাম থেকে ফেরার সময়ে মামাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তিতুরাম কেন শিবনাথের বাড়ি গিয়েছিল?

সেদিন ছিল নারী সঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। আর হেমাঙ্গিনীকে যেন সে ভালবেসে ফেলেছিল। যতই হেমাঙ্গিনী তাকে তাড়িয়ে দিক, ও কিন্তু হেমাঙ্গিনীর জন্যে পাগল।

হেমাঙ্গিনী কাপড় পালটালো না, চুল আঁচড়ালো না, তার জন্যেও তিতুরামের কোন দুঃখ নেই। হেমাঙ্গিনী তো সামনে বসে আছে, এইতেই তিতুরাম খুশী।

তিতুরাম বলল, চুপ করে বসে রইলে কেন? দরজাটায় খিল দিয়ে এস।

হেমাঙ্গিনী বলল, আমার কথার জবাব দিলে না তো? কোত্থেকে এতরাত্রে এলে? বাবাকে তো বলেছ দেওড়াগ্রাম থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছ, কিসের নেমন্তন্ন? কি ছিল?

তিতুরাম বলল, কেন বিশ্বাস হচ্ছে না! এই দেখো। বলে সে পেটের কাপড়টা সরালো।

হেমাঙ্গিনী একবার আড়চোখে তাকাল, তারপর বলল, তা কিসের নেমন্তন্ন? তা তো কই বললে না।

বাব্বা তুমি যেন উকিলের বাড়া। অত কৈফিয়ত তলব করছ কেন?

হেমাঙ্গিনী বলল, কেন কৈফিয়ত তলব করছি বুঝতে পারছ না? না বুঝে চুপ করে আছ।

তিতুরাম বলল, কি?

হেমাঙ্গিনী বলল, তুমি সত্যি করে বল তো? তুমি কোন বিয়ে করতে যাও নি!

তিতুরাম জীবনে মিথ্যে কথা কোনদিন বলে নি কিন্তু হেমাঙ্গিনীর পাল্লায় পড়ে বলতে বাধ্য হল। হেমা, তুমি বিশ্বাস কর, আমি বিয়ে করতে যাই নি। দেওড়া গ্রামে একটা বিয়ে ছিল বটে কিন্তু সে অন্যের বিয়ে। আমি শুধু নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম।

হেমাঙ্গিনী তবু বলল, আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার ঐ যে মামা, ঐ মামাই তোমার সর্বনাশ করছে। মামা যে কি করে ভাগনের সর্বনাশ করতে পারে আমি জানি না।

তিতুরামের আর কিছু তখন ভাল লাগছিল না। বয়স তখন কম। রক্ত টগবগ করে ফুটছে। এখন কি এই জেরার মুখে পড়লে ভাল লাগে? আর ঐ মেয়ে যেন পিসিমার মত শুধু জেরা করেই চলেছে। তিতুরাম কোথায় এত রাত্রে এত পথ হেঁটে এল!

তিতুরাম বলল, হেমা যাও না দরজাটায় খিল লাগিয়ে এস না।

হেমা হঠাৎ বলল, না। তুমি আজ বাড়ি যাও।

আজ এতদিন পরেও তিতুরামের সে সব কথা মনে পড়ছে। হেমার কথা শুনে তিতুরাম হেমার পা দুটি জড়িয়ে ধরেছিল। হেমা, তুমি কি আমার কথা বুঝতে পাচ্ছ না?

হেমা গম্ভীর গলায় বলেছিল, বুঝেছি বলেই তো বাড়ি যেতে বলছি।

আমি যদি বাড়ি না যাই!

তাহলে তুমি এখানে ঘুমিয়ে থাকো, আমি ওঘরে মার কাছে যাচ্ছি!

তুমি কি আমার কোন কথাই বিশ্বাস করবে না?

হেমা ম্লান হেসে বলল, বিশ্বাস করতে পারলে তো আমারও ভাল লাগত।

তিতুরাম চিৎকার করে বলল, তোমার কি শরীরে দয়া মায়া নেই। না, তুমিও আমার মত সঙ্গ পাবার জন্যে উদগ্রীব নও।

হেমার চোখে যেন জল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, সে কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার তো দুটো স্বামী নেই যে একটাকে ছেড়ে দিয়ে আর একটার কাছে গিয়ে থাকব।

হেমা চলে গেল, সারা রাত সেই ঘরে শুয়ে বৃশ্চিকের দংশন অনুভব করতে লাগল তিতুরাম। ঐ হেমাকে দেখেই তিতুরাম বুঝেছিল সব মেয়ে এক নয়।

সত্যভামা, অনুসূয়া, বকুলবালা যেমন স্বামী সঙ্গলাভের কথা ভাবে নি। তেমনি হেমাও ঐ বয়সে তিতুরামকে বার বার ফিরিয়ে দিয়েছিল।

কুলরক্ষার জন্যে যতই মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হোক। মেয়েরা

একদিক দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে। সেখানে কোন আন্দোলন নেই। বিদ্যাসাগরের মত বই লেখা নেই। সেখানে ওরা নিজেরাই নিজেদের স্বভাবে সম্রাজ্ঞী।

কে যায়?

তিতুরাম থমকে দাঁড়াল। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারল না লোকটা কে? তিতুরাম বলল, আমি তিতুরাম গাঙ্গুলী।

অ, তা কোথায় থাকা হয়?

তিতুরাম বুঝল লোকটা তাকে চেনে না। গ্রামের নাম বললো।

কি করা হয়?

এবার অন্ধকার সরে যেতে তিতুরাম লোকটাকে দেখতে পেল। লম্বা চওড়া চেহারা। পরণে ধুতি পাঞ্জাবি। বেশ রসিক লোক। শিক্ষিত মনে হচ্ছে।

তিতুরাম কি করা হয় বলতে ইতস্তত করতে আবার প্রশ্ন এল, এবার একটু ধমকের সুর। কি করা হয় জিজ্ঞাসা করছি, তা চুপ থাকা হচ্ছে কেন?

আজ্ঞে, যেটা করি সেটা বলতে পারবো না।

এবার একটু হাসি। চুরি-টুরি করা হয় নাকি?

আজ্ঞে না!

তাহলে বলতে লজ্জা কেন?

আজ্ঞে বিয়ে ব্যবসা করে পেট চালাই।

মুখখানি গম্ভীর হল। অ, তাহলে ব্রাহ্মণ। তা কটা বিয়ে করা হয়েছে?

তিতুরাম ইতস্তত করল।

আবার অন্ধকারে অট্টহাসি শোনা গেল। তিতুরাম একটু মনে মনে চটে উঠল। আচ্ছাই লোক। তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে শুধু হাসছে। কিন্তু সে কথা বলা গেল না। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছে খুব উঁচুদরের।

আবাব বলল সে, ক'টা বিয়ে যখন বলতে লজ্জা, তখন করা হয় কেন? তা দেখে তো মনে হচ্ছে, বয়েস হয়েছে। এই বিয়ে ব্যবসাই কি সারাজীবন করা হচ্ছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগরমশাইরা কিছুই করতে পারছেন না। আর করবেন কেমন করে? স্বার্থপর বামুনরা যদি নিজেদের কামনাবাসনাকে জাগিয়ে এই বহু বিবাহ বজায় রাখেন তাহলে আর কি করার আছে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আবার কি কোন বিয়ে নাকি?

না, একটু এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম।

একটা উপদেশ দিচ্ছি। বয়েস তো অনেক হল, আর এসব নাইবা করলেন।

তিতুরাম বলল, আজ্ঞে না। আর আমি এসব করি না।

তাহলে কি করা হয় ?

তিতুরাম চুপ।

লোকটি কি যেন বুঝল। আবার অট্টহাসি হাসল। সমাজে যখন ঘুণ ধরেছে তখন কে আর একে রোধ করবে ? আমরা শিক্ষিত লোকেরা এই সব ভেবে ভেবে মুষড়ে পড়ি। এর জন্যেই স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন। অবশ্য তারও চেষ্টা হচ্ছে। বেথুন সাহেব, বিদ্যাসাগর চেষ্টা করে চলেছেন। এতেই মনে হয় সমাজের কোন উপকার হবে।

লোকটি পথ ছাড়লে তিতুরামের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। লেখাপড়া জানা লোকের সামনে পড়লেই তিতুরামের কেমন ভিরমি লাগে।

মেজমামার সামনেও এমনি হত। মেজমামা যতই অংবংতং করে সংস্কৃত আওড়াক কিন্তু সামনে দাঁড়ালে আর কথা মুখে আসত না।

মেজমামা বলত, কি রে তিতু, তুই যে আমায় দেখে বোবা হয়ে গেলি ?

তা সত্যিই মেজমামাকে দেখে তিতুরাম বোবা হয়ে যেত। মেজমামার সংস্কৃত শব্দ ওর মাথায় ঢোকে নি কিন্তু মেজমামা তো অম্লানবদনে তা গড় গড় করে বলে যায় ? শুধু বলে না, যে-সব টিকিধারী পণ্ডিতরা ওদের বাড়িতে আসে, মেজমামা তাদের সঙ্গে অনর্গল শাস্ত্র আউড়ে যায়।

রাখহরি মামা বলে, বাঁশবনে শিয়াল পণ্ডিত। ওর তো বন্ধুরা কিছু জানে না। তাই নিজেই উলটা পালটা বকে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে।

রাখহরি মামা যে মূর্খ তিতুরাম জানে। কত বিয়ের সময়ে সে দেখেছে রাখহরি মামা পুরুতের বলা মন্ত্রগুলোও স্পষ্ট বলতে পারে না।

একবার তিতুরাম জিজ্ঞাসা করেছিল, মামা, তুমি মন্ত্রগুলো ভাল করে বলো না কেন ?

রাখহরি মামা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলেছিল, বলব কেন ? আসলে কি বিয়ে করছি নাকি ?

রাখহরি মামা তিতুরামের এই ব্যবসার গুরু। বলতে গেলে এক রকম রাখহরি মামাই হাত ধরে তাকে এই ব্যবসায় ঢুকিয়েছিল কিন্তু তিতুরাম গুরুর সব উপদেশ মেনে নেয় নি। যেমন, রাখহরি মামা সহজে কোন স্ত্রীর ভার গ্রহণ করতে চায় নি। অথচ এই ব্যবসায় আছে, স্ত্রী যদি ভরণ পোষণ বাবদ মাসোহারা নিয়ে স্বামীর কাছে আসে তাহলে স্বামীর স্ত্রীকে রাখতে হবে।

কিন্তু রাখহরি মামা এ সব ব্যাপারে একেবারে অন্য মানুষ। অন্য মানুষ বলতে গেলে গোঁয়ার।

একবার একটা কাণ্ড হয়েছিল। হঠাৎ মা একদিন সকালে চিৎকার করে ডাকল, দাদা একটু বেরিয়ে এস তো। কে এসেছে দেখো?

রাখহরি মামার আগে তিতুরাম বেরিয়ে এসেছিল। আর দেখে, উঠোনে পরমাসুন্দরী একটি রমণী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তিতুরাম বলল, মা এ কে?

মা হেসে বলল, বল্ না কে?

তিতুরাম বলল, বাহ আমি কেমন করে বলব?

মা বলল, তোর মামাকে ডাক তাহলেই জানতে পারবি?

তিতুরাম বলল, কোন মামাকে ডাকব? মেজমামা না সেজমামা?

মা ধমক দিল, সেজমামা কি বিয়ে করেছে? তাকে ডাকবি?

ডাকতে আর হল না। রাখহরি মামাই বেরিয়ে এল, কি ব্যাপার এত গোলমাল কিসের?

মা বলল, গোলমাল আবার কোথায় দেখলে!

হঠাৎ মামার চোখ সুন্দরী রমণীটির দিকে পড়ল, গিরি, এ কে?

মা বললো, বল না?

মামা বলল, কি করে বলব, চিনতে তো পারছি না!

তিতুরামের দিকে ফিরল, কি রে তোর কোন বউ?

তিতুরাম লজ্জা পেয়ে গেল, আমার বউ হতে যাবে কেন? তিতুরাম তখন সাতটা মাত্র বিয়ে করেছে। তার মধ্যে চারটেই এখনও বালিকা। মাটিতে বসে পুতুল খেলে।

তিতুরাম বলল, আমার কোন মামী কিনা দেখো?

মামা বোধহয় মেয়েটিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্যে এসেছিল। মা বলল, আহা মেয়েটি অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে আছে, দাদা ওকে অন্তত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।

মামা চোখ পাকিয়ে মাকে বলল, জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাব! তুই কি বলছিস্ গিরি?

মা চুপ করে রইল। মামাব রাগ তো মায়ের জানা আছে। এখুনি হয়ত কোন অপমানজনক কথা বলে বসবে।

মামা ততক্ষণে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি কে গো? কোথেকে এসেছ?

হঠাৎ মেয়েটি মামার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

মামা এসব ব্যাপারে খুবই কঠিন মানুষ। এতটুকু নম্র হয়ে মেয়েটিকে পায়ের কাছ থেকে তুলল না। উল্টে বলল, পায়ের কাছ থেকে ওঠো। আমি কান্না একেবারে পছন্দ করি না।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাছ থেকে উঠে চোখ মুছে ফেলল।

রাখহরি মামা বলল, এবার বলো তোমার পরিচয়। কোত্থেকে এসেছ? কি নাম? বাবার নাম কি? কেন আমার বাড়িতে এসে হামলা করছ!

জানা গেল, মেয়েটির নাম সত্যবতী, বাবার নাম, লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়। নিবাস চিত্রশালী!

একাই এসেছ, না সঙ্গে কেউ এসে দিয়ে গেল?

সত্যবতী অস্ফুটস্বরে বলল, বাবা দিয়ে গিয়েছে।

মামা বলল, তোমার বাবা আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না কেন?

সত্যবতী চুপ। হঠাৎ সে আঁচলের খুট খুলে এক গোছা টাকা মামার হাতে দিতে গেল। তাছাড়া একটা সুটকেশ ও পোঁটলা দূরে মাটিতে রাখা আছে।

মামা বলল, টাকা তুমি রেখে দাও, ও আমি চাই না।

মা বলল, এবার মেয়েটাকে একটু ঘরে যেতে দাও। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে মেয়েমানুষ!

মামা বলল, দাঁড়িয়ে আর থাকতে হবে না। চল বাছা, পথ দিয়ে চলতে চলতে একটা গরুর গাড়ি ধরে নেব। কি ভেবে চিৎকার করে ডাকল গঙ্গা, গঙ্গা আছিস?

গঙ্গা ছোট মামার নাম। কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না।

মা বলল, দাদা, তুমি বৌদিকে জায়গা দেবে না?

মামা বলল, তুই থাম। মেয়েছেলে যেমন মেয়েছেলের মত থাকবি।

মামা মামীকে একরকম তাড়াতে তাড়াতে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেল।

এটাই মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ি। সামনে জনা পাঁচেক লোক। কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে।

তিতুরাম তাদের জিজ্ঞাসা করল আজ্ঞে, ভগবান চাটুজ্যের বাড়ি কি এটা?

লম্বামত লোকটি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। তা আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

তিতুরাম একটু রেগে গেল। এত পথ এসেছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। পায়েও খিল ধরে যাচ্ছে। বয়েস হয়ে গেলে যা হয়। এই বয়েসে কি এত পথ হাঁটা পোষায়? তার ওপর এদেরও বা কেমন ধারা ব্যবহার ট্যাবহার। কোথায় বর এল, খোঁজ খবর নে। তা না বরকেই খোঁজ নিতে হচ্ছে।

তিতুরাম একটু বিরক্ত মুখেই কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, ভগবান চাটুজ্যেকে একটু খবর দিতে পারেন ?

আঁজ্ঞে আপনার কি দরকার একটু যদি বলেন ?

ওঁকে গিয়ে বলুন না তিতুরাম গাঙ্গুলী এসেছে। তা হলেই হবে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক লোকটি বলল, এখন কি ভগবানকাকা আসতে পারবে ? হয়ত বিয়েতে বসে গেছে।

বিয়ে ? তিতুরামের একটু খটকা লাগল। সে তো এই পথে দাঁড়িয়ে আছে ! তা বিয়েটা হচ্ছে কার সঙ্গে ? ব্যাপারটা মনের মধ্যে চেপে তিতুরাম সেই লম্বা লোকটিকে বলল, একটু গিয়ে ভগবানবাবুকে বলুন না তাহলেই হবে।

লম্বা লোকটি আর কোন কথা বললো না, বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

তিতুরাম একটু সরে গিয়ে বাড়িব ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা এক ঝলক আলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ বাড়ির মধ্যে থেকে উলুধ্বনি ও মুহুর্মুহু শংখধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। তিতুরাম একটু ঘাবড়ে গেল। এ কেমন করে হয় ? বর তো সে। সে তো এই পথে দাঁড়িযে আছে। তাহলে বিয়ে হচ্ছে কাব সঙ্গে ?

এই দুশ্চিন্তার মধ্যেই সেই লম্বা লোকটি বাড়ির ভেতর থেকে বেবিযে এল। আঁজ্ঞে আপনাকে মামা বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে বললেন।

কেন আপনাব মামা বাইরে আসতে পারলেন না ?

লম্বা লোকটি বলল, লোকজন খেতে বসেছে। মামা সেখানে ব্যস্ত। আপনি চলুন না। আপনিও তো খাবেন ? সেখানে মামার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

তিতুরাম আড়চোখে শুধু লোকটিকে দেখল কিন্তু লোকটির মুখ সরল। সে মুখে কোনই কৌতুক নেই। তিতুরাম একটু নিশ্চিন্ত হল, যাক্ বাবা কেউ বুঝতে পারে নি। সে যে বর, এ কথা প্রকাশ হয়ে গেলে হাসির উদ্রেক হত বেশী। বর পথে, বিয়ে হয়ে গেছে। এরকম ঘটনা কি কখনও শোনা গেছে।

কিন্তু ভগবান চাটুজ্যে এ কাজ করল কেন ? দেরী তার একটু হয়েছে বটে। তবে লগ্ন তো একেবারে বয়ে যায় নি। লগ্ন বয়ে গেলে না হয় কথা ছিল। বিয়ে তো আর তিতুরাম করতে চায় নি। অনেক বিয়ে জীবনে করেছে। কিন্তু ভগবান চাটুজ্যে হেঁটে হেঁটে তাকে রাজী করিয়ে ছাড়ল। অবশ্য তিতুরাম তো জানে, নতুন বিয়েতে প্রাপ্তিযোগটা ভালই হয়।

তা তিতুরাম একরকম বলতে গেলে প্রাপ্তিযোগের জন্যেই বিয়েটা করতে গিয়েছিল। প্রাপ্তিযোগের জন্যেই তিতুরাম এখন বিয়ে করে।

ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। সেই সকাল থেকে শুধু হাঁটছে আর হাঁটছে। মাঝে একবার সৌদামিনীর ওখানে বিশ্রামটা নিয়েছিল ?

এই যে মামা ইনি আপনাকে ডাকছিলেন ?

তিতুরাম তাকিয়ে দেখল সারি সারি সবাই খেতে বসেছে। ভগবান তাদের তদারক করে চলেছে।

হঠাৎ তিতুরামকে দেখে ভগবান একটু মুষড়ে পড়ল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না। তিতুরামও তাকিয়ে রইল ভগবান চাটুজ্যের দিকে।

হঠাৎ ভগবান বলল, যাক যা হবার হয়ে গেছে। গাঙ্গুলীমশাই, আপনি অন্তত আহারটা করে যান। এই কে আছিস ? কোণের দিকে একটা পাতা পেতে দেতো।

তিতুরামের আর তখন কিছু ভাল লাগছিল না। এত ক্লান্ত লাগছিল যে শুয়ে পড়তে পারলে হত। অন্তত ভগবান যদি খেতে না বলে শোবার জায়গা করে দিত তাহলে সে সবচেয়ে খুশি হত।

কে যেন খাবার জায়গা থেকে বলল, চাটুজ্যেমশাই আপনার জামাই বেশ ভাল হয়েছে। বয়েসও কম। কুলরক্ষার বিয়ে হোক তবু বেশী বয়েসের জামাই হলে যেন মনে হত সদ্য সদ্য মেয়েটার গলা টিপে মারা হল। তা সেই বুড়ো বর আসে নি তো !

ভগবান একবার আড়চোখে তিতুরামকে দেখল। তিতুরাম তখন কোন কথাই কানে নিচ্ছে না। কানে সবই যাচ্ছে বটে। ওর শুধু ইচ্ছে, ভগবান যেন তাকে শোবার জায়গা দেয় একটু।

কোণের দিকে একটা পাতা দেওয়া হল। নুন, লেবু দেওয়া হলে ভগবান বলল, গাঙ্গুলীমশাই যা হয়ে গেছে তার জন্যে ক্ষমা করে দেবেন। একটু সেবা করুন।

সেবা করুন অর্থাৎ ঐ সারিতে বসা লোকগুলির মত আহার করুন। যে বাড়িতে সে বর হয়ে সবার উপরে স্থান পেত সেখানে তাকে অনুগ্রহ করা হচ্ছে। তিতুরাম বলল. চাটুজ্যেমশাই, বর যেন কোথায় বসেছে ? চলুন না একটু দেখে আসি।

আসলে বরের চেহারাটা একবার দেখবার ইচ্ছে তিতুরামের। সে না হয় বুড়ো হয়ে গেছে কিন্তু ভগবান চাটুজ্যে যুবক বর পেলেন কেমন। একটু ঈর্ষা যে না হয়েছে তিতুরামের তা নয়।

ভগবান বলল, চলুন না আপনাকে বর দেখিয়ে নিয়ে আসি।

বসার ঘরে মেয়েদের গুলতানি হচ্ছিল। দরজা জোড়া করে সবাই হাসি মস্করা করছিল।

ভগবান তাদের তাড়া দিল। এই সর সর। কতক সরলো, কতক সরলো না।

নিতু ভট্টাচার্য।

নিতু ভট্টাচার্যও তিতুরামকে দেখতে পেয়েছিল। কনের পাশ থেকেই নিতু ভট্টাচার্য বলল, দাদু খুড়ি। খুড়ো মশাই, খুড়িমাকে আমি লুটে নিলাম। মেয়েরা কে কি বুঝল, বোঝা গেল না, সবাই ঢলে ঢলে এ ওর গায়ে পড়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

নিতু ভট্টাচার্য বলল, তোমরা হাসছ কেন ? আমার কথায় কিছু বুঝতে পারছ ?

সমস্বরে মেয়েরা বলল, না, না, কি ?

নিতু ভট্টাচার্য বলল, কনেকে দেখিয়ে, এই যে আমার পাশে মাধুরী বসে আছে এতক্ষণে ঐ খুড়ো মশাইয়ের স্ত্রী হয়ে যেত। আর আমার হত খুড়িমা, কিন্তু ভগবানের অসীম করুণা, খুড়ো মশাই আসতে দেরি করল, আর মাধুরী আমার খুড়িমা না হয়ে— ।

নিতু ভটাচার্য কথাটা শেষ না করে মাধুরীর চিবুক ধবে তুলে বলল, আমাব বউ হল।

তিতুরামের মাথার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। সত্যিই আর তার বিয়ে করা উচিত নয় ! নিতু যতই তাকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করুক নিতুব পাশে মাধুরীকে মানিয়েছে সুন্দর।

সোদামিনীর কথা মনে এল, এখনও তুমি বিয়ে করছ ? বিয়ের সাধ তোমাব আর মিটবে না ?

সত্যিই তিতুরামের আর বিয়ে করা উচিত নয়। বয়স হলে সব জিনিস যেমন ছেড়ে দেওয়া উচিত ! তেমনি তিতুরামেরও এ ব্যবসায় ইস্তফা দেওয়া উচিত।

নিতু ভট্টাচার্য বলল, কই খুড়ো মশাই বসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? মনে বুঝি খুব আফসোস হচ্ছে। এই তো ক'ঘণ্টা আগে বললাম, আর কেন ? এবার ক্ষান্ত দাও। তা যখন করবে না, আমার আর কি বলার আছে।

তিতুরাম বলল, চাটুজ্যে মশাই চলুন। আমার আবার ফিরতে হবে।

নিতু ভট্টাচার্য বলল, না না শ্বশুর মশাই, খুড়ো মশাইকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। এ রকম অপমানিত হয়ে খুড়োমশাই চলে যাবে সে কিছুতে হবে না।

ভগবান বলল, গাঙ্গুলী মশাই, আমার ও জামাই-এর ইচ্ছে আপনি আহার করে যান।

মামা অধিকাংশ বিয়ের খোঁজ নিজেই নিয়ে আসত। আর যারা বিয়ের ব্যাপারে আসত, তারা রাখহরি মুখোপাধ্যায়ের খোঁজ করত।

একদিন গোলগাল ফর্সা এক ভদ্রলোক এসে রাখহরি মামার খোঁজ করল। নেই শুনে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে ?

তিতুরাম বলল, আমি ওর ভাগনে, কেন ?

ভদ্রলোক বলল, আমার নাম পূর্ণচন্দ্র আচার্য, বলো, আমি এসেছিলাম।

মামা আসতে সে কথা তিতুরাম বললো। মামা জিগ্যেস করল, আর কিছু বলেছে ?

তিতুরাম বলল, না। কেন, আর কিছু বলার ছিল ?

মামা বলল, না।

এর দুদিন পরে মামা বলল, চ, আমার একটা বিয়ে দেখে আসবি ?

তিতুরাম বলল, কেন মামা ? তুমি তো তোমার বিয়ে কখনও দেখতে নিয়ে যাও না ?

মামা বলল, যাই নি তো। পূর্ণবাবুর ইচ্ছে হয়েছে, তোকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। ওর তোকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে।

সেই পছন্দই যে এমন ঘটনা ঘটাবে কে জানতো ? মামা বিয়ের আসরে। তিতুরাম একটা জায়গায় চুপ করে বসেছিল।

হঠাৎ পূর্ণবাবু এসে ডাকলেন, তিতুরাম তুমি একটু ভেতর বাড়িতে এসো তো।

তিতুরাম বলল, ভেতর বাড়িতে, কেন ?

পূর্ণবাবু বললেন, আমার স্ত্রী তোমায় দেখতে চাইছে।

ভেতর বাড়িতে অনেক মহিলা। পূর্ণবাবুর স্ত্রী কোনজন বোঝা গেল না। চওড়া লাল পেড়ে কাপড় পরা একজন দোহারা চেহাবার মহিলা তিতুরামের হাত ধরল।

পূর্ণবাবু সেখানে ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কথাই ঠিক। আমাদের পাঁচির সঙ্গে মানাবে ভাল।

পূর্ণবাবু বললেন, কিন্তু তা সম্ভব কি করে ? রাখহরি তো বিয়েতে বসে গেছে।

পূর্ণবাবুর স্ত্রী বলল, উঠিয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও। আমার পাঁচির বয়স মাত্র এগার বছর। আর ঐ ষাট বছরের বুড়ো বিয়ে করতে এসেছে। তুমি যদি ওর সঙ্গে বিয়ে দাও তাহলে আমি গলায় দঁড়ি দিয়ে মরব, এ আমি তোমায় বলে দিচ্চি।

পূর্ণবাবু বললেন, তুমি রাগ করছ কেন মানদা। তিতুরামের দেখা তো আগে পাই নি। পেলে কি আর ওর মামাকে বিয়ে করতে বলি ?

তিতুরামকে নিয়ে পূর্ণচন্দ্র বিয়ের বাসরে এল।

রাখহরিমামা তখন বিয়ের পিঁড়িতে বসে। রাখহরি মামা বলল, কই শ্বশুরমশাই বিয়ের ব্যবস্থা কর। লগ্ন যে বয়ে গেল।

পূর্ণচন্দ্র রাখহরি মামার দিকে চুপ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়ত ভাবছিলেন, বদরাগী এই লোকটার সামনে কি করে প্রস্তাবটা পেশ করবে ?

কিন্তু না করেও উপায় নেই। ওদিকে মানদা ভেতর বাড়ি থেকে স্বামীকে শাসাচ্ছে।

পূর্ণচন্দ্র বললেন, মুখুজ্যেমশাই, একটা নিবেদন ছিল।

রাখহরি মামা ভুরু কুঁচকে বলল, কি ?

বলছিলাম কি, পূর্ণচন্দ্র ঢোক গিললেন। যেভাবে রাখহরি মামা তাকাচ্ছিল, পূর্ণচন্দ্রের পিলে চমকে যাচ্ছিল।

আপনার ভাগনেটিকে দেখতে বেশ ভাল। আর বয়েসও কম।

রাখহরি মামা বলল, তা হয়েছেটা কি ? স্পষ্ট করে বলুন। ওরকম তোতলাচ্ছেন কেন ?

পূর্ণচন্দ্র বলল, বলছিলাম কি ? আমার পাঁচির বয়স তো এগার ! আপনার ভাগনের সঙ্গে মানাবে ভাল।

সে কথা এখন আর বলে কি হবে ? পাঁচি এখন তিতুর মামী হতে যাচ্ছে।

পূর্ণচন্দ্র একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ভেতর বাড়ি থেকে মানদার শাসানি শোনা গেল।

পূর্ণচন্দ্র ঢোক গিলে বললেন, না মুখুজ্যেমশাই বলছিলাম কি পাঁচির তো এখনও বিয়ে হয় নি যদি আপনার ভাগনের সঙ্গে—

কথাটা তখনও পূর্ণচন্দ্রের শেষ হয় নি, মামা একেবারে বিয়ের পিঁড়ি থেকে লাফিয়ে উঠল, কি আমাকে এতবড় অপমান ? তিতু চলে আয়, এই চাঁড়া-লের বাড়িতে আর একদণ্ডও নয় !

হঠাৎ ভেতর বাড়ি থেকে একগলা ঘোমটা দিয়ে মানদা এসে তিতুরামের হাত ধরল। চাপা স্বরে বলল, তুমি এস জামাই আমি তোমায় ভেতর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে সাজিয়ে দিই। আমার পাঁচির সঙ্গে তোমায় মানাবে ভাল।

মামা বলল, বেশ তিতুই তাহলে আমার ব্যবসায় বাগড়া দিল।

পূর্ণচন্দ্র বললেন, মুখুজ্যেমশাই আপনি রাগ করবেন না। আপনি তো মরে গেলে আমার মেয়ে তাড়াতাড়ি বিধবা হয়ে যেত তার চেয়ে আপনার ভাগনের সঙ্গে বিয়ে হোলে তবু কিছুদিন মেয়েটা আমার সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে।

মামা ভেংচে বলল, থাক, আর সান্ত্বনার বাক্যি ঝাড়তে হবে না।

পূর্ণচন্দ্র বললেন, মুখুজ্যেমশাই, আপনি রাগ করবেন না, খেয়ে যান। আপনি না খেয়ে গেলে নবদম্পতির অকল্যাণ হবে।

মামা বলল, থাক, তোমার বাড়িতে কে খায়। মামা এমন একটা খিস্তি করল সে কথা এখনও তিতুরামের মনে আছে, কিন্তু তিতুরাম অত অভদ্র নয়।

ও বোঝে, বয়স হলে সবারই প্রতিপত্তি কমে যায়। আজ যদি তিতুরামের বয়স না হত তাহলে কি ওর দেরী করে আসার জন্যে নিতু এসে মাধুরীর পাণি-গ্রহণ করতে পারত ?

ভগবান বলল, তাহলে চলুন গাঙ্গুলী মশাই দুটো মুখে দিয়ে নিন।

তিতুরাম বলল, থাক চাটুজ্যেমশাই আজ আমার শরীরটা খুব ভাল নেই।

বিদ্যাসাগরমশাই যে বই লিখেছেন তার মধ্যে হুগলী জেলার বহু কুলীন ব্রাহ্মণের নাম আছে। মেজমামা সেই বই একখানা কিনে নিয়ে এসে চিৎকার করে পড়তে লাগল।

মা বলল, কি বই রে মেজদা। কি বই তুই পড়ছিস ?

মেজমামা মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে সংস্কৃত কলেজে পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখা করে আসে।

একদিন এসে বলল, জানিস গিরি, বিদ্যাসাগরমশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে এলাম। কি অদ্ভুত লোক ! কি পাণ্ডিত্য ? তাঁর কাছে সব সময়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে। আর মেয়েদের কি ভাল চোখে দেখেন !

মা বলল, বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বুঝি মেয়ে নেই ?

মেজমামা বলল, তা কেন ? বিদ্যাসাগরমশাইয়ের অনেক মেয়ে।

তা নিজের মেয়েদের ছেড়ে পরের মেয়েদের ভাল চোখে দেখেন কেন ? লোকটা নিশ্চয় ভাল নয় ?

মেজমামা রেগে গেল, বলল, কি বললি গিরি ? বিদ্যাসাগরমশাই ভাল লোক নয় ? বিদ্যাসাগরমশাই শুধু বিদ্যার সাগর নয়, দয়ারও সাগর।

মা একটু চুপ করে রইল। মা মুখ্য মানুষ। তার বুদ্ধিতে এত কুলোয় না। সে তো শুধু জানে, যে লোক মেয়েদের ভালো চোখে দেখে সে লোকের স্বভাব ভাল নয়।

মেজমামা বলল, তুই বিশ্বাস করলি না, না !

মা বলল, আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ। আমার কথা ছেড়ে দাও। বলো বিদ্যাসাগরমশাই কি বললেন ?

মেজমামা বলল, কিছু বললেন না। আমি তাঁর দয়ার একটা নমুনা দিই তোর কাছে। এ ঘটনাটা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। একদিন তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে যাচ্ছি। হঠাৎ একটি দুঃস্থ মেয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা. বিদ্যাসাগরমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা যাবে ?

মেয়েটির কাপড় জামা খুব পরিস্কার নয়। স্বাস্থ্য ভাল কিন্তু মুখখানি কেমন যেন শুকনো। জিজ্ঞেস করলাম, দেখা করবে কেন? কি দরকার?

মেয়েটি বলল, উনি শুনেছি অনেককেই দয়া করেন। আমার বাবা মা কেউ নেই। একজন অনাত্মীয়ের বাসায় থাকতাম, কাল তারা আমায় বিনা দোষেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল।

কেন?

মেয়েটি একটু মুখ নিচু করে বলল, অপবাদ দিচ্ছে—ওদের ছেলের সঙ্গে যেন আমি কিছু করেছি? তারপর মেয়েটি মুখ তুলে ছল ছল চোখে বলল, বিশ্বাস করুন আপনি, আমি কিছু করি নি। ওরা আমায় তাড়াবে বলে এইসব দুর্ণাম রটালো।

তাড়াবে কেন?

আমি নাকি বেশী খাই। আমার জন্য খরচ বেশী। আমায় জামা কাপড় দিতে হয়। ওরা আমার বদলে একটা ছোট ছেলে যোগাড় করেছিল। তার তো খরচ কম। আপনি বলুন না, বিদ্যাসাগরমশাইকে এসব বললে তিনি আমার একটা ব্যবস্থা করে দেবেন না?

আচ্ছা তুমি একটু দাঁড়াও! আমি গিয়ে খবর দিচ্ছি।

বিদ্যাসাগরমশাই শুনে ছুটে সেই মেয়েটির কাছে চলে এলেন। মেয়েটির দুঃখের কাহিনী শুনে বললেন, তুমি আমার কাছে এসে ভাল কাজ করেছ।

এই বলে একটা চিঠি লিখে দিলেন। বললেন, এঁর কাছে চলে যাও। তোমার থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। তুমি কি পড়াশুনা করতে চাও?

মেয়েটি শুনে কি বলবে ভেবে পেল না।

বিদ্যাসাগরমশাই বললেন, এখন স্ত্রী-শিক্ষা দরকার। স্ত্রী-শিক্ষা সুরু হলে সমাজের এই অন্ধকার দূর হবে। তোমাদের দুঃখও দূর হবে।

মেয়েটি বলল, আমি পড়াশুনা করব। বিদ্যাসাগরমশাই শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন, আমি যার কাছে পাঠাচ্ছি তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

মা শুনে বলল, বিদ্যাসাগরমশাই সত্যিই তো খুব ভাল লোক। মেয়েদের জন্যে কত ভাবেন!

মেজমামা বলল, শুধু ভাবা নয়, এদিকে দিনের পর দিন পাণ্ডিত্য বাড়ছে, আর মেয়েদের কথা ভাবছেন। ওঁরই চেষ্টায় বাল্যবিবাহ বন্ধ হতে চলেছে। বিধবা বিবাহ শুরু হচ্ছে।

মা বলল; তা তোদের বিদ্যাসাগরমশাইয়ের কাছে আমায় একটু নিয়ে যেতে পারিস?

মেজমামা বলল, তুমি আবার তাঁর কাছে যাবে কেন? তোমার কি অভাব?

মা আর কথা বলতে পারল না। সত্যিই তো মার কি অভাব? ভাইদের বাড়িতে সারা জীবন কাটিয়ে শুধু তাদের সংসার ঠেলে গেল। মার আর কি অভাব?

সেই মেজমামাই একদিন একটা বই কিনে নিয়ে এসে চিৎকার করে পড়তে লাগল। মা জিজ্ঞাসা করল, ও কিসের বই মেজদা, অত জোরে জোরে পড়ছ কেন?

মেজমামা বলল, বিদ্যাসাগরমশাই বহু বিবাহ নিয়ে বই লিখেছেন। এই বইয়ের মধ্যে দাদার নামও আছে।

মা বলল, দাদার নাম কেন? দাদা কি করেছে? দাদা বিদ্যাসাগরমশাইয়ের কাছে গিয়েছিল!

মেজমামা বড়মামার কোন কিছুই পছন্দ করে না। রেগে গেল, বলল, দেখবে দাদার কোমরে দড়ি দিয়ে জেলে ধরে নিয়ে যাবে।

মা বলল, কেন? দাদা কি করেছে? দাদাকে জেলে নিয়ে যাবে কেন?

মেজমামা বলল, ঐ যে গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করছে? এই দেখ না, দাদার নামের পাশে আটাত্তরটা বিয়ের নাম। মেজমামা বইটা বাড়িয়ে ধরে মাকে দেখাল। মা পড়তে পারে না শুধু ছাপা অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

মা বলল, তাহলে তিতুর নামও তো ওঠা উচিত। সেও তো অনেকগুলি বিয়ে করেছে।

মেজমামা বলল, উঠবে উঠবে। তোমায় তো আমি বারণ করেছিলাম, ওকে দাদার সঙ্গে মিশতে দিও না।

মা বলল, আমি মিশতে দিয়েছি! আমি তো কতবার বলেছি এত বিয়ে করিস্ না।

এই সময়ে তিতুরাম আর রাখহরি এল। মা বলল, দাদা দেখো, মেজদা কি বই এনেছে। ওতে তোমার নাম উঠেছে।

রাখহরি মামা বলল, কি রে কালী, আমার কোথায় নাম উঠেছে রে।

মেজমামা রাখহরি মামার কথার জবাব দিল না। বইটা বগলদাবা করে অন্যত্র চলে গেল।

রাখহরি মামা বলল, কি রে গিরি, কোথায় নাম উঠেছে রে?

মা বলল, কি যেন একটা ছাপানো বইতে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের লেখা। মা এরপর ভয়ের সঙ্গে বলল, দাদা শুনছি নাকি যারা বেশি বিয়ে করছে তাদের কোমরে দড়ি দিয়ে জেলে নিয়ে যাবে।

রাখহরি মামা চোখ পাকিয়ে বলল, কে বললো এ কথা। ঐ বাঁশবনে শিয়াল পণ্ডিত কালীটা তো!

মা বলল, তাচ্ছিল্য কর না দাদা। বিদ্যাসাগর মশাই বই লিখেছেন।

মামা বলল, কে বিদ্যাসাগর।

মাও বুঝিয়ে মামাকে বলতে পারল না, কে বিদ্যাসাগর। আর মামাও বুঝল না। মামা ওসব বাইরের খবরে এতটুকু কান দেয় না। সে শুধু ওৎ পেতে থাকে, ঘটক এসে দরজার কড়া নাড়ছে কিনা! ঘটক এলেই মামার মুখে স্ফূর্তি।

আর অমনি মামা নাচতে নাচতে ঘরে এসে উড়ুনিটা গায়ে দিয়ে মাকে বলবে, গিরি, আমি আজ ফিরব না।

মা বলবে, কেন দাদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার যে ভাত রান্না করেছি।

মামা রেগে যাবে। মামা রেগে গেলে সে এক সাংঘাতিক মূর্তি। মা এই মূর্তি দেখে কতদিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছে। মায়ের মুখ দেখেই বোঝা যায়, মা ভাইদের এই ভাত খেতে আর পারছে না। এত জুলুম কি ভাল লাগে! এত জুলুম কেন করবে? স্বামীর জুলুম নয়, ছেলের জুলুম নয়, ভাইদের জুলুম। মা যেন মনে করে ভাইদের ভাত খাওয়া তার ঘোরতর অন্যায়। মার এই চিন্তাধারারও হদিশ মেলে।

মা কতদিন বলেছে, তিতু, ভদ্রভাবে কিছু রোজগার কর। অন্তত শান্তিতে আমি তোকে নিয়ে আলাদা সংসার করি।

কিন্তু তিতুরামের জীবনে যে ভদ্রভাবে সংসাব করা নেই, সে তিতুরাম জেনে ফেলেছে।

মায়ের কথায় তাই আর ওর মুখে কথা যোগায় না।

মেজমামার কথায় রাখহরি মামা কোন আমল না দিক কিন্তু তিতুরাম দিয়েছে। ওর বার বার মনে হয়, সিপাই ঠিক একদিন আসবে আর তার কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে! এতই ওর ভয় জাগে যে একদিন মেজমামাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মেজমামা, বিদ্যাসাগর মশাই কি লিখেছে।

মেজমামা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলল, তাতে তোর কি দরকার।

তিতুরাম বলল, বলো না। মা বলছিল বহুবিবাহ নিয়ে কি যেন বই লেখা হয়েছে। তার মধ্যে বড়মামার নাম আছে।

মেজমামা বলল, যেমন কর্ম তেমনি ফল। আমি তো বাঁশবনে শিয়াল পণ্ডিত। বড় বড় লোকের সই দিয়ে দরখাস্ত লাটসাহেবের কাছে চলে গেছে, তার মধ্যে বর্ধমান মহারাজ, নবদ্বীপ মহারাজ, কলকাতার তাবড় তাবড় লোক আছে।

তিতুরাম কেঁদে ফেলল, বলল, মেজমামা আমাকেও তাহলে ধরে নিয়ে যাবে?

মেজমামা বলল, তা নিয়ে যাবে বৈকি? তুইও তো অনেকগুলো বিয়ে করেছিস?

তিতুরাম তাড়াতাড়ি মেজমামার পা দুটি জড়িয়ে ধরল। ওর ধারণা এই বিপদ থেকে মেজমামা তাকে বাঁচাতে পারে। মেজমামার সঙ্গে কলকাতার বড় বড় লোকের আলাপ আছে।

তিতুরাম বলল, মেজমামা তুমি আমায় বাঁচাও। আমি আর এ কাজ কক্ষণো করব না।

মেজমামা গম্ভীর হয়ে বলল, পা ছাড়। আমি তো তোকে অনেকদিনই বলেছি, দাদা মুখুজ্যে বংশের কুলাঙ্গার।

আমার বাবা কি দশ পাঁচটা বিয়ে করেছিল? না বাবা বিয়ে করতে পারত না। যারা ভদ্রলোক তারা ঐ জঘন্য কাজ করে না।

তিতুরাম মায়ের কাছ থেকে শুনেছিল তার দাদু এ বংশের সব চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তি। যখন দেশের মধ্যে কুলিনরা গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করছে, দাদু একটাই বিয়ে করেছিল। আর সে বউকে সব চেয়ে ভালবাসত। এত ভালবাসত যে দেশের লোক বলল রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মুখুজ্যে বংশের উজ্জ্বল চরিত্র।

তা মা তোমার বিয়ে এমন করে হল কেন?

মা কপালে হাত দিয়ে দেখাত, সে আমার কপাল।

সেই বংশের ছেলে রাখহরি মুখুজ্যে গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করে চলেছে! বিয়েটা তার ব্যবসা।

তিতুরাম বলল মেজমামা আমি ভুল করে বিয়ে করেছি। এবারের মত আমায় বাঁচিয়ে দাও। আর কক্ষণো আমি করব না।

মেজমামার মুখ দেখে মনে হল না মেজমামা তার কথা শুনবে। তিতুরাম গিয়ে মাকে ধরল, মা তুমি মেজমামাকে বল না, মেজমামা তো আমার কথা শুনছেই না।

মা বলল, আমার কাছে কাঁদুনি গাস্ না। আমি কি করব, আমি তো আর বিয়ে করতে বলি নি।

তিতুরাম বলল, কিন্তু তুমি বারণও তো কর নি। বারণ যদি করতে তাহলে কি আমি এ কাজ করতাম?

মা অবাক হয়ে গেল, তিতু একথা বলবে ভেবে পায় নি। মা গম্ভীর হয়ে বলল, তুই একথা বলতে পারলি তিতু? আমি তোকে বারণ করি নি?

তিতুরাম চুপ করে রইল। সে তো জানে একথা ঠিক নয়। কিন্তু তিতুরাম এখন কি করবে। যদি সিপাই এসে কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যায়। চব্বিশ বছরের যুবক তিতুরাম মায়ের সামনেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। মা তুমি কোন উপায় ভাবতে পারছ না?

মা বলল, আমি কি উপায় ভাবব? আমার কি ভাবার আছে? তুই বরং এক কাজ কর, হেমাকে এখানে নিয়ে আয়।

মা জানত না, তিতুও বলে নি! অনেকদিন আগে দেওড়াগ্রাম থেকে ফেরার সময় যে হেমার বাড়িতে রাত্রিবেলা কাটিয়ে এসেছিল, আর হেমা কি ব্যবহার করেছে

সব চেপে গিয়েছিল। বরং বলেছিল, শ্বশুরমশাই শিবনাথের ওখানে রাত্রিবেলা কাটিয়ে এলাম।

এখন হেমার কথায় তিতুরাম একটু চুপ করে রইল।

মা বলল, হেমা এলেই সব দিক রক্ষা হবে। যদি সিপাই আসে দাদাকে নিয়ে যায়, হেমা তোকে বাঁচাবে? ওরা মেয়েছেলে দেখলে আর বেশি জোর করবে না। হেমা যদি বলে, আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? স্বামী তো আমাকেই শুধু বিয়ে করেছে। আর যা করেছে কুলরক্ষা। তা যদি মেয়ের বাবারা জোর করে তাহলে আমার স্বামী কি করতে পারে?

তিতুরামের যুক্তিটা খুব পছন্দ হল। হেমা এলে সে সত্যিই সিপাইদের ঠেকাতে পারবে, এমনি অহঙ্কারী মেয়ে হেমা, কিন্তু তিতুরাম তার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করবে কেমন করে?

কিন্তু কোন উপায়ও দেখা গেল না। অগত্যা তিতুরাম শ্বশুরবাড়ি ছুটল।

কি গো কি ব্যাপার? পথ ভুলে নাকি?

না, পথ ভুলে কেন? আমি তোমার কাছেই এসেছি।

আমার কাছে? হেমা বিস্মিত হল? কিন্তু মুচকে হাসল।

তিতুরাম বলল, হেমা আমার খুব বিপদ। তোমায় সাহায্য করতে হবে।

হেমা একটুও চমকাল না। বরং লঘুভাবে বলল, তা আমার কাছে কেন? তোমার তো আরো অনেক বউ আছে।

এই তো শুনলাম, কদিন আগেও একটা বিয়ে করেছ। আর তার সঙ্গে রাত্রিবাসও করেছ।

তিতুরাম বলল, হেমা তুমি কি আমার কোন কথাই শুনবে না? আমার খুব বিপদ।

হেমা বলল, বিপদটা কি বলোই না তখন থেকে শুধু বিপদ বিপদ করছ?

তিতুরাম বলল, আমার কোমরে দড়ি দিয়ে জেলে নিয়ে যাবে।

যত বড় দৃঢ় চরিত্রের হোক না তবু তো সে মেয়ে! মুখ শুকনো করে হেমা বলল, তা তুমি কি করেছ? চুরি টুরি করেছ নাকি?

তিতুরাম বলল, সেই কথাটাই তো বলছি। চুরি করলে তোমার কাছে আসব কেন? বিদ্যাসাগর মশাই লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত করেছে, আইন পাশ হলে আমাকে জেলে ধরে নিয়ে যাবে।

হেমা বলল, বিদ্যাসাগর মশাই কে? তোমাদের দেশের লোক?

তিতুরাম বলল, না, দেশের লোক হবে কেন? কলকাতায় থাকে। মেজমামার বন্ধু।

তা কলকাতার লোক, তোমায় ধরতে আসবে কেন? তুমি তার কি করেছ?

বিদ্যাসাগর মশাই কে তিতুরাম বোঝাতে পারল না, আর সে কি করেছে স্পষ্ট করে বলতে পারল না। বহু বিবাহ তো হেমাও অপছন্দ করে।

তাই তিতুরাম বলল, ওসব কথায় কাজ নেই। তুমি বরং আমাদের বাড়িতে চলো। মা তোমায় যেতে বলেছে।

হেমা বলল, না।

তিতুরাম রেগে গেল, বলল, আমার এত বড় বিপদে তুমি যাবে না ?

হেমা বলল, তুমি কি আমার একটা কথাও শুনেছ যে যাব ?

তিতুরাম বলল, কিন্তু আমায় যদি জেলে ধরে নিয়ে যায় তোমার দুঃখ হবে না ?

বন্ধ ঘরের মধ্যে এই চেঁচামেচিটা এমনই হচ্ছিল যে হেমার মা দরজায় এসে কান পেতেছিল। হঠাৎ বলল, ও হেমা জামাই যখন নিয়ে যেতে চাইছে যা না।

হেমা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। মায়ের মুখের ওপর ঝঙ্কার তুলে বলল, তুমি কি বলছ মা ? আমি সতীন ঘর করব ?

মা বলল, তা কি হয়েছে ? সব মেয়েই তো সতীনের ঘর করছে। আমি কি করছি না ? তোর বাবা এ পর্যন্ত কতগুলো বিয়ে করেছে বল্।

হেমা জানত, বাবাও গোপনে এই বহু বিবাহ ব্যবসা ধরেছে। তাই সে চুপ করে রইল। মা বলল, মেয়েছেলের অত অহঙ্কার ভাল নয়।

এই কথা শুনে হেমাও রেগে গেল। বলল, বেশ আমার অহঙ্কার তো অহঙ্কার। আমি যাব না বলেছি, যাব না। তোমার জামাইকে বলো না বিয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে। কেন ও বিয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে পারে না।

তিতুরাম কিছুতেই হেমাকে নিয়ে যেতে পারল না। মা বাবা হেরে গেল। পাড়া পড়শীরা হেরে গেল। মেয়ে সেই ধনুক ভাঙ্গা পণ নিয়ে রইল। কেবলই বলতে লাগল, ঐ স্বামীর ঘর আমি করব না। আগে বলো বিয়ে ব্যবসা বন্ধ করতে।

কিন্তু তিতুরাম তখনই প্রতিজ্ঞা করত, বলত, ঠিক আছে আর আমি বিয়ে ব্যবসা করব না। কিন্তু ঐ মেয়ের অহঙ্কার দেখে তার মেজাজ চড়ে গেল। মনে মনে বলল, থাকগে। আর আমি ঐ মেয়ের পায়ে ধরে সাধব না।

সেই রাত্রিবেলাতেই তিতুরাম বাড়ি চলে এল।

মা বলল, এ কি রে হেমা এল না ?

তিতুরাম চুপ করে রইল।

মা বলল, কথা বলছিস্ না কেন ?

তিতুরাম বলল, কোনদিন হেমা এ বাড়িতে আসবে না।

মা বলল, কেন ?

আমি অনেক বিয়ে করি হেমা চায় না।

তা তুই তো বলতে পারতিস আর করব না। সে কথা বলেছিলিস? সে কথা বলার পরও হেমা বলল আসবে না।

তিতুরাম চুপ করে রইল। সে যে ও কথা বলে নি, সে জানে।

মা বলল, মেয়েটা সত্যিই ভাল। ঠিক আমার মত। আমিও যেমন এ সব চাই না মেয়েটাও চায় না। ওরে তিতু, মেয়েরা মেয়েদের অসম্মান কি সহ্য করতে পারে? হেমাকে নিয়ে যদি আমি ঘর করতে পারতাম তাহলে আমার সারা জীবনের দুঃখ ঘুচে যেত।

মায়ের ঐ করুণ আর্তনাদ যেন তিতুরামের হৃদয়ে স্পর্শ করল কিন্তু সে কি করবে? সে যে নিরুপায়।

কদিন ধরে তিতুরামের মনের মধ্যে জেল, হাজত, সিপাই আসার ভীতি রইল।

রাখহরি মামাও যে কথাটা একেবারে ফেলে দেয় নি, তাও দেখা গেল। বাড়িতে চুপ করে বসে থাকে। কোথাও বের হয় না।

মা দেখে বলে, ও দাদা তুমি যে বড় একটা বেরোচ্ছ না, কি হল তোমার? তুমি কি বিয়ে ব্যবসা ছেড়ে দিলে?

রাখহরি মামা ভেতর ঘরের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, গিরি, কালী যে বইটা এনেছে সেটা একবার আনতে পারিস?

মা বলে, কেন? কি হবে ও বই?

আমার নামটা কোথায় আছে একবার দেখতুম। যদি আইন টাইন হয়ে যায় তাহলে তো জেলে পচতে হবে।

একদিন মামা দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, গিরি, ও গিরি?

মা হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, কি হয়েছে দাদা? অত হাঁপাচ্ছ কেন?

কালী আছে?

না।

কোথায় গেল?

এই তো দুজন লোক এসেছিল, বেরোল।

মামা বলল, জানিস কালী আমার কি সর্বনাশ করেছে? কলকাতায় গিয়ে সমস্ত হুগলী জেলার ব্রাহ্মণকুলীনদের নাম বিদ্যাসাগর মশাইকে দিয়ে এসেছে।

মা বলল, কে বললো তোমায় এ কথা?

মামা বলল, খবর কি আর চাপা থাকে? দেশের লোকই একথা বলছে।

মা বলল, খবরটা মিথ্যেও তো হতে পারে। ভাই ভাইয়েরই সর্বনাশ এ ভাবে করবে না?

মামার সে কথা ভাল লাগল না, মেজমামার জন্যে দাওয়ায় চুপ করে বসে রইল।

তিতুরাম ভাবল, আজ একটা খণ্ডযুদ্ধ লেগে যাবে। মারামারিও হয়ে যেতে পারে।

কিছুক্ষণ বাদে মেজমামা বাড়ি ফিরল। হাতে কটা পুঁথি। তাল পাতার পুঁথি লাল দড়ি দিয়ে বাঁধা। রাখহরি মামাকে দেখে ভ্রূক্ষেপ না করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে উদ্যত হল।

মামা ডাকল, কালী!

মেজমামা দাঁড়াল। মেজমামার পণ্ডিতদের সঙ্গে সর্বদা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করে মাথাটা গরম থাকে। মেজমামা বলল, কি?

মামা বলল, তুই এ জেলার ব্রাহ্মণদের নাম ঐ বই লিখিয়েটাকে দিয়েছিস?

মেজমামা বলল, বই লিখিয়ে! সে আবার কে?

ঐ যে তোর বিদ্যেসাগর না কি সাগর?

মেজমামা বিরক্ত হল, বলল, যাঁর নাম জান না তাঁকে নিয়ে আলোচনা কর না। তুমি তো তাঁর নখেরও যুগ্যি নও।

কি এত বড় কথা! মামা লাফিয়ে নামল দাওয়া থেকে।

মেজমামা বলল, মারবি নাকি দাদা, লাফিয়ে নামলি যে?

তোকে মারাই উচিত। তুই আমার কত বড় সর্বনাশ করেছিস জানিস।

মেজমামা বলল, বেশ করেছি। পথ ছাড়। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে অধর্ম করছ, আবার কথা বলছ।

মেজমামা রাখহরি মামার সামনে দিয়েই ঘরে চলে গেল। আর রাখহরি মামা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাখহরি মামার মধ্যেও যে অধর্মটা ছিল সেটা বোঝা গেল!

তিতুর খুব আনন্দ হল, যাক বাবা আব বিয়ের ব্যবসা করতে হবে না।

গুরু তো ঐ মামাই। মামাই তো যত বিয়ের খোঁজ নিয়ে আসে।

কয়েক মাস চুপচাপ কেটে গেল। মামাও খেয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। তিতুও মামার মত অবসর যাপন করে।

তখনই তার সঙ্গী হয় ছোটমামা। ছোটমামার আর কোন চিন্তা ভাবনা নেই। দুপাশে দুই লক্ষ্মী, সরস্বতী। স্বর্ণমঞ্জরী ও কনকলতা।

ছোটমামা হাত বদলাবদলি করে দুজনের সঙ্গে মেশে। কখনও স্বর্ণমঞ্জরীর সঙ্গে মেশে। তাদের বাড়িতে গিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাকে।

স্বর্ণমঞ্জরীর মা তাকে খাতির করে, বাবা গঙ্গা, তুমি আছ বলেই স্বর্ণটার দিন কাটছে।

আবার কনকলতার বাড়িতে থাকলেও কনকলতার বাবা বলে, বাবা গঙ্গা, তুমি আছ বলে কনকটা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে।

এই দুজনের সাহায্যে ছোটমামার পকেটেও কিছু পয়সা এসে যায়।

ছোটমামা পয়সা বাজিয়ে বলে, তিতু, বল তো আমার পকেটে কত টাকা আছে ?

তিতুরাম বলে, কত আর একটাকা দু'টাকা !

ছোটমামা বলে, দূর, তুই বলতে পারলি না। আমার পকেটে পঁচিশ টাকা আছে।

তিতুরাম অবাক। ছোটমামা তুমি রোজগার করছ নাকি ?

ছোটমামা বলে, দূর আমি আবার রোজগার করব কি ? স্বর্ণর বাবা বলে দিয়েছে আমাকে আর রোজগার করতে হবে না।

কেন ?

ছোটমামা তিতুর কানের মধ্যে মুখ নিয়ে এসে যে কথা বললো সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ তো মন্দ কথা নয়। রোজগারও হবে আবার একটা মেয়ের সঙ্গও পাবে।

কিন্তু তিতুর কপালে এসব জুটল না। তিতুর ভাগ্য যে খারাপ। না হলে এই অধর্মের কাজই তাকে সারাজীবন করতে হয়।

চমকে উঠল তিতুরাম। পুঁটুলিটা বেয়ে বেয়ে কি যেন মাথায় উঠেছে। উঠে বসল সে। কখন ক্লান্তিতে চোখে তন্দ্রা নেমেছিল জানে না। আর তন্দ্রা আসাও তো বিচিত্র নয়! শরীর বলে তো একটা কথা আছে! সেই তো সকাল থেকে শুধু হাঁটাই অবশ্য জীবনের সম্বল হয়েছে। এই যে নিতু ভট্টাচার্য তাকে অপমান করল। খুড়োমশাই, দাদু কত কি বললো। ও কি একদিন বুড়ো হবে না। ওকেও কি ওর চেয়ে কম বয়সী কারুর কাছ থেকে এমনি কথা শুনতে হবে না।

ভাগ্য। ভাগ্যটাই মানুষকে নানা ভাবে ঘোরায়। ভাগ্যে যদি থাকে তোমার জীবনে কষ্ট, তাহলে তোমাকে কষ্ট করতেই হবে। এই যে তিতুরাম সারাজীবন ধরে দেখল. সে তো অন্যকিছু করতে চেয়েছিল কিছু হল কি।

পুঁটুলিটা বেয়ে কি যেন উঠছিল। একটু একটু আলো আকাশে। বটগাছটার পাতাগুলো এমনিই ঘন যে দিনের বেলাতেই অন্ধকার লাগছে। তিতুরাম পুঁটুলিটা নিয়ে বটগাছের বাইরে বেরিয়ে এল।

ও হরি। এ যে লাল পিঁপড়ে! তিতুরাম তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা খুলল। অনেক বছরের পুরনো খাতাটা পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিল। মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

এটাই তিতুরামের ব্যবসার মূলধন। এটা হারালে আর রোজগারের দফা রফা

গয়া। তখন তিতুরাম কি খাবে? তখন তাকে এই বুড়ো বয়সে কে দেখবে? অবশ্য সৌদামিনী, সোনামণির মত মহিলারা আছে। কিন্তু ওরা তো এমনি খেতে দেবে না। এ বয়েসে আর ওসব ভাল লাগে না! মেয়েরা যেন না পেয়ে পেয়ে জঘন্য হয়ে গেছে। ঠিক ওদের বাঘিনীর মত মনে হয়। শুধু আড়ালে দাঁড়িয়ে ওৎ পেতে থাকে। তারপর সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এ সব তো তিতুরাম এই এত বয়স পর্যন্ত কম দেখল না। আগে আগে অল্প বয়সে এসব ভাল লাগত। তখন শরীরে রক্তের জোর। তাছাড়া নিত্য নতুন নারী। পাড়া প্রতিবেশীরা সামনেই বলত, তিতুরামেব কপাল ভাল। স্বর্ণমঞ্জরী, কনকলতা বলত, তিতুরাম এত ভাল মানুষ গোছের লোক অথচ··· । বলে তাবা ফিক্ ফিক্ করে হাসত।

স্বর্ণমঞ্জরীর ওপর তিতুরামের একটু লোভ ছিল। কতদিন ছোট মামার অনুপস্থিতিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছে। স্বর্ণও যে বুঝতে পারে নি এমন নয়।

সেই স্বর্ণ একদিন বলল, তিতু, অমন কবে দেখো কেন আমায়। ওর ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসির রেখা।

তিতুরাম বলল, তোমায় দেখতে ভাল লাগে।

স্বর্ণমঞ্জরী বলল, ভাল লাগে তো আমাদের বাড়ি এলেই পার।

তিতুরাম বলল, ছোট মামা যদি রাগ করে?

স্বর্ণমঞ্জরী রেগে গেল, বলল, কেন আমি কি তোমাব ছোট মামার কেনা নাকি?

তবু তিতুরাম স্বর্ণের দিকে এগোতে পারে নি। স্বর্ণব শরীর যতই সুন্দর হোক না কেন তবু তো স্বর্ণ ছোট মামার। তিতুরাম জীবনে কাবও অনিষ্ট সাধন করবে না বলেই পণ করেছিল। কিন্তু তাতে কি দুর্ণাম ঠেকাতে পারল? জন্মই যার গোলমেলে ভাবে হয়েছে তার জীবনে ভাল কি হবে? এই যে তিতুরাম আজ পাঁচের কোঠা শেষ করে এই বয়েসে পথে পথে ঘুরছে, সেই তো তার ভবিতব্য। না হলে কপালে অমন মামাও একজন জুটবে কেন?

তার জন্যেই যে তিতুরাম পালটে গেল সে তো তা জানে। আজ মামা নেই, মা নেই, কেউ সামনে নেই, কিন্তু তিতুরাম আছে।

এক একটা বিয়ে তিতুরাম করে আসত, আর মা মুখ শুকনো করে বলত, তিতু আবার বিয়ে করলি?

মামা বলত, তা করেছে তো কি হয়েছে? বিয়ে করা খারাপ নাকি?

তারপর মামা হেসে বলত, আমি তিতুকে আমার আদর্শে গড়ছি। দেখবে তিতুর কত টাকা হয়ে যায়।

তা মামার সত্যিই অনেক টাকা হয়েছিল। মেজমামা, সেজমামা, ছোট মামার ছিল না। রাখহরি মামার শুধু টাকা ছিল না, ঘরে অনেক আসবাব ছিল। ঘরে

যেন লক্ষ্মী ভরে ছিল। খাট, বিছানা, দেরাজ, আলমারি, কাপড় চোপড় অঢেল। একবার বড় মামার এক বন্ধু এসেছিল। বড় মামার বন্ধু ছিল না। কি করে যে এ লোকটি বড় মামার বন্ধু হল ভগবানই জানেন। সে বড় মামার ঘরের এত সব আসবাব দেখে আনন্দিত হয়ে বলল, রাখহরি, তুমি তো হে করিৎকর্মা লোক। শ্বশুরবাড়িগুলো থেকে বেশ কষে বাগিয়েছ।

রাখহরি মামা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলল, সাফল্যই তো পুরুষাকারের আসল স্বরূপ। আমি কি বোকা যে ভালমানুষ হওয়ার সুযোগ নেব?

রাখহরি মামা সত্যিই একটু ভিন্ন চরিত্রের লোক সে তিতুরাম পদে পদে দেখেছিল। আর সে তার যোগ্য শিষ্য। যখন তিতুরাম অন্য কিছু করার আর সুবিধে পেল না তখন মামারই ব্যবসায় লেগে গেল।

তিতুরামও টাকা চায়। মামাও টাকা করেছিল। তিতুরামের অনেক টাকার দরকার। অনেক টাকা না হলে মার দুঃখ ঘুচবে না। ঐ টাকার জন্যে তো মা সারাজীবন ভায়ের বাড়ি পড়ে থাকল। মা আগে যে বিয়ে করলে রাগ করত, পরে আর রাগ করে নি।

তিতুরাম শ্বশুর বাড়ি থেকে জিনিস পত্তর আনলে তুলতে তুলতে বলত, এই জলচৌকিটা দিয়েছে তো বেশ।

কিংবা বলল, তিতু এবারের শাড়িখানা খুব ভাল। এত সুন্দর লালপাড় আব এমন জমি কখনও কেউ দেয় নি।

তিতুরাম যেন ক্ষেপে গেল। মামার মত সম্পত্তি করতে হবে। মামার মত টাকা, আসবাব। মামা বিয়ের খোঁজ আনলেই তাই সে বলত, মামা দেবে থোবে কেমন? কম দিলে আমি কিন্তু ঐ বিয়েতেই বসব না।

মামা বলত, আরে ব্যবস্থা করেছি, করেছি। তুই কি আমাকে এত কাঁচা ছেলে ভাবিস? না আমি কখনও তোকে ন্যাড়া শ্বশুরবাড়িতে বিয়ে দিতে নিয়ে গিয়েছি?

অবশ্য মামারও এর মধ্যে একটা স্বার্থ আছে। মামা তো জাঁহাবাজ লোক। স্বার্থ না থাকলে কোন উপকারই করতে চায় না। সে ভাগনে হোক আর নিজের মার পেটের ভাই হোক। মামা শ্বশুববাড়ি থেকে বেশি আদায় করে দিলে কিছু বখরা নিত।

মামা বলত, তিতু, এটা যেন গিরিকে আর বলিস্ না। ও তো মেয়েমানুষ, কি ভাবতে আবার কি ভাববে।

তিতুরাম তো আর কাঁচা ছেলে নয়। তখন তার বেশ বয়েস হয়েছে। বুদ্ধিও বেড়েছে।

তিতুরাম বলত, তুমি কি ক্ষেপেছ মামা? আমি কি আমার ব্যবসার গোপন ব্যাপার কাউকে বলি?

সেই মামা একদিন এসে বলল, তিতু একটা কাজ করবি ? অবশ্য তার জন্যে অনেক টাকা পেয়ে যাবি। মামা চাপাস্বরে যে কথাগুলি বলল, শুনে তিতুরাম স্তম্ভিত হয়ে গেল।

মামার দিকে ও অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

না না মামা, হেমাকে আমি ঐভাবে হারাতে চাই না।

মামা ধমক দিল, আবে শোনই না আমার কথা ভাল করে।

কিন্তু তিতুর কানে কোন কথাই গেল না। তার বার বার হেমার মুখটাই মনে পড়তে লাগল। হেমাকে যে প্রথম জীবনের ভালবাসা দিযে আপন করে নিয়েছিল। হেমার সঙ্গে না হোক তার কোন দৈহিক সম্পর্ক, তবু তো হেমা তিতুরামের প্রথমা স্ত্রী।

কে হে বাবা, এই রাত বিরেতে আমারই মত গাছতলায় কাটাচ্ছ ?

তিতুরাম চমকে উঠল, তার মত কে এই গাছতলায় শুয়ে আছে। সে তো বেঁচীগ্রাম থেকে বেরিয়ে অনেকদূর এসে এই গাছতলায় শুয়েছিল। জায়গাটা ঠিক চেনা যায় না। তবে যেভাবে তিতুরাম এসেছিল, নকুড়দহ পর্যন্ত এসেছে বলে মনে হয়। লোকটি টলতে টলতে তিতুরামেব কাছে এগিয়ে এল। মুখের কাছে মুখ নিতেই ভগ করে একটা গন্ধ, তাড়ির গন্ধ। লোকটি আলো অন্ধকারে তিতুরামের মুখ দেখে বলল, চিনতে তো পারি না। কে হে বাবা তুমি ? তুমিও কি আমার মত তাড়ি গিলেছ ?

কিন্তু লোকটির যা অবস্থা চেনবার মত ক্ষমতা ছিল না। তখনও শরীর টলছে। চোখে দেখতে পাচ্ছে না। লোকটি আবাব বলল, কথা বলছ না কেন ? তুমি কি বাবা বোবা নাকি ? না আমার মত খুব গিলেছ। তা বাবা বেশ করেছ। অমৃতে তো অরুচি নেই। এস গলা জড়াজড়ি কবে শুয়ে পড়ি।

বলে লোকটা গলায় হাত দিতেই তিতুরাম হাতটা সরিয়ে দিল।

লোকটি বলল, কি ভাল লাগল না, তা বাবা এই বাত বিরেতে গাছতলায় কেন ? আমি নয় বাড়ি যেতে পারি না বলে গাছতলায় পড়ে থাকি। তোমার কি দুঃখ ? কথা বলো, কথা বলো। চুপ করে থেকো না।

তিতুরাম বলল, কি বলব ?

লোকটি বলল, কেন কিছু বলার নেই ! তোমার পরিচয়, নিবাস, কি কর ?

তিতুরাম নিজের পরিচয় দিল, কি করে বললো।

লোকটি হঠাৎ মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও। ওহে তুমি যে

আমার জামাই। আমার নাম জগন্নাথ ভট্টাচার্য। তুমি তাহলে বেঁচে আছ? এই যে শুনলাম, মারা গেছ!

তিতুরাম অবাক হয়ে গেল, বলল, কে বললো!

জগনাথ বলল, সে আর তোমার শুনে দরকার নেই। তা কোথায় গিয়েছিলে?

সে কথা আর বলা গেল না। এই বয়েসে বিয়ে, তার ওপর অপমান। শুনলে এই তাড়ি খাওয়া শ্বশুরমশাই হো হো করে হেসে উঠবে। বলল, এদিক দিয়ে ফিরছিলাম।

ফিরছিলে তো আমিও বুঝতে পেরেছি। আর গাছতলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিলে তাও দেখেছি। তা কোথায় আজকাল থাকা হয়?

আজ্ঞে!

কি জিজ্ঞাসা করছি বুঝতে পারছ না? হ্যাঁ হে জামাই আমি যখন আমার মেয়ে জগদম্বার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম তখন তো এত বোকা ছিলে না! তা বয়েস হয়েছে বলে একটু হতে পারে, কিন্তু তোমার আমার বয়স তো প্রায়ই এক। আর দেখো, আমি তাড়ি খেয়ে বুঁদ। কই একটুও তো বেতাল কথা বলছি না।

তিতুরাম তাকিয়ে দেখল জগন্নাথের দিকে। পা টলছে বটে কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যাক তোমায় যখন পেয়েছি তখন চলো। দেখবে বাড়িতে আমার কি মজা!

কিন্তু! তিতুরাম বুঝতে পারছিল না এ তার শ্বশুর কিনা! লোকটা তাড়ি খায়! বরাবরই মনে হয় খায়। কিন্তু কোন তাড়ি খাওয়া শ্বশুর আছে কি না সে স্মরণে আনতে পারল না।

একবার অবশ্য মামা একটা কাণ্ড করেছিল। মামা মাঝে তাড়ি খাওয়া ধরেছিল। সে কি কাণ্ড! মামা তাড়ি খেয়ে আসে, আর মা ছুটে এসে তিতুরামকে ঘুম থেকে তুলে বলে, তিতু তিতু দেখ, তোর মামা আবার কি সব ছাইপাঁশ গিলে এসেছে।

তিতুরাম গিয়ে দেখত, মামা তাড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে উঠোনে খুব চেঁচামেচি করছে।

তিতু গিয়ে হাত ধরত।

মামা বলত, কে, রে এত বড় স্পর্ধা আমার হাত ধরে?

মামা আমি। তুমি ঘরে চলো।

মামা বলত, কেন যাব? তুই হাত ধরবি কেন? ছেড়ে দে।

মামা তুমি যে টলছ, পড়ে যাবে।

মামা রেগে যেত, বলত, কি বললি, আমি টলছি? এই তো আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু এক পায়ে দাঁড়াতে গিয়েই মামা পড়ে গেল।

তিতুরাম তারপর সেই দশাসই মামার নাকে মুখে মাথায় জল ঢেলে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

প্রায়ই তিতুরামকে এই রকম করতে হত। মামা রাত্রিবেলা টলতে টলতে বাড়ি এলেই মা গিয়ে তিতুরামের ঘুম ভাঙাত।

তিতুরামের ভীষণ বিরক্ত লাগত। বলত, তুমি মা জান তো, আমার ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম হয় না।

মা বলত, আমি জানি তো, কিন্তু কি করব বল ? দাদা তো আর সহজ মানুষ হয়ে আসে না।

তিতুরাম বলত, সহজ মানুষ হয়ে আসে না তো কি হয়েছে ? আমায় তুমি আর ডাকবে না।

কিন্তু তিতুরাম এ কথা বললেও আবার মা ডাকলে উঠে আসত। মামার সঙ্গে তো তার শুধু ভাগ্নের সম্বন্ধ নয় !

মামা বেঁকে বসলে তার আয়ের পথ বন্ধ। তখন তিতুরাম বেশ দু-পয়সা আয় করছে। তাই মামার অনেক অত্যাচারই তাকে সহ্য করতে হত। ওর কাছে অবশ্য এ সব অত্যাচারই।

সেই মামাই একদিন বলল, তিতুরাম একটা বিয়ে।

তিতুরাম লাফিয়ে উঠল, কোথায়, কোথায় ?

মামা হেসে ফেলল, বলল, তুই যে একেবারে লাফিয়ে উঠলি ? বিয়ে ব্যবসায় খুব রস পেয়েছিস না ?

তা তিতুরাম রস কম পায় নি। বয়স তো বেশি নয়। নিত্য নতুন মেয়ের সান্নিধ্য, তার ওপর টাকা জমছে।

তিতুরাম আবার টাকা মায়ের কাছে রাখত না। নিজের একটা কাঠের বাক্সে গুণে গুণে চাবি দিয়ে রাখত।

মার এতে খুব দুঃখ হত। বলত, তিতু, তোর টাকা আমি কি খেয়ে ফেলব ? আমার কাছে রাখলে আমি ভালভাবেই রাখব।

তিতুরাম অবশ্য সেটা বুঝত। কিন্তু ওর কেমন যেন মনে হত, টাকা-পয়সা নিজের কাছে রাখাই ভাল। ওতে শরীর গরম থাকে।

সেই মামাই নিয়ে এল বিয়ের সম্বন্ধ। টাকা-পয়সা ভালই দেবে। কিন্তু মেয়ের বাবা তাড়ি খাওয়া লোক।

তিতুরাম শুনে গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, মামা এ কি তোমার তাড়ি খাওয়া বন্ধু ?

মামা বলল, হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ? তোর তো টাকা পাওয়া নিয়ে কথা।

তিতুরাম বলল, ও বিয়ে আমি করব না। আমার টাকা পাওয়ার দরকার নেই।

মামা বলল, আমি যখন বলেছি তখন তোকে বিয়ে করতেই হবে। জগন্নাথকে আমি কথা দিয়েছি।

মামা আমি বলছি করব না, তবু তুমি জোর করবে? তাড়ি খাওয়া বাড়িতে আমি বিয়ে করতে পারব না।

মামা বলল, জগন্নাথ নয় তাড়ি খায়? যে মেয়েটাকে বিয়ে করবি সেও খায় নাকি?

কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে ভীষণ ওজর আপত্তি করতে পারা গেল না। মামার কথাই রাখতে হল। কিন্তু মেয়ে দেখে তিতুরামের অজ্ঞান হয়ে যাবার মত হল।

মা জগদম্বাই বটে। আলকাতরার মত কালো গায়ের রঙ। মোটা। মুখখানি এতই বিসদৃশ যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। শুভদৃষ্টির সময় তাই তিতুরাম বার বার চোখ বন্ধ করতে লাগল। আর ওদিকে কনে মাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা এক বিঘোত দাঁত ঝিকিয়ে হাসল।

মামার দিকে তাকালে তিতুরাম। সে চাউনি ভাল নয়। মামা তখন তাড়ির নেশায় বুঁদ। শ্বশুর মামা দুজনেই তাড়ির নেশায় বুঁদ হয়ে কি যেন নিয়ে হাসাহাসি করছে।

তা জগন্নাথ ভট্টাচার্য মেয়ের জন্যে খরচ কম করল না। টাকা পেয়েই তিতুরামকে খানিকটা শান্ত হতে হল। বিয়ের পর দুই তাড়িখোরের পাল্লায় পড়ে দু একবার তিতুরামকে শ্বশুরবাড়িতে যেতেও হয়েছিল। আব ঐ বৌয়েবই সান্নিধ্যে···।

সেই সব কথা মনে আসতেই তিতুরাম আতঙ্কে লোকটার দিকে ফিরল। এ তাহলে সেই শ্বশুর জগন্নাথ। বলল, আজ্ঞে আমার একটু কাজ আছে। পরে একদিন যাব।

না হে না। আমার একমাত্র মেয়ে। তোমায় যখন পেয়েছি তখন ছাড়ছি না।

জগন্নাথ তিতুরামের হাত ধরে ফেলল।

মেয়েটা কতদিন ধরে বিধবার সাজে রয়েছে। বাপ হয়ে কি সেটা দেখতে পারি?

বিধবার সাজে? তিতুরাম অবাক হয়ে গেল। তাহলে সে মরে গেছে, এরা জানত! তাহলে তার মরবার সময় হয়েছে? বুঝি মরে গেলেই এই জগন্নাথ ভট্টাচার্যের খপ্পরে পড়তে হত না।

সেই রাতে তাড়ি খাওয়া লোকটার সঙ্গে তাকে হাঁটতে হল। লোকটার কিন্তু জ্ঞান টনটনে। এতটুকু বেচাল হচ্ছে না। বরং তিতুরামই মাঝে মাঝে গর্তে পড়ে যাচ্ছে। অমনি জগন্নাথ হাত চেপে ধরে বলছে, কি জামাই চোখের মাথা খেয়েছ নাকি?

তিতুরাম চুপ।

আকাশের অন্ধকার আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসছে। পথ চলাও প্রায় সহজ হয়ে এল। হাঁটছে তো হাঁটছেই। সেই চলার মধ্যেই জগন্নাথ তাড়ির নেশায় বক বক করে যাচ্ছে। অবশ্য কথাগুলি খুব উল্টো পাল্টা বলছে না। ওর কথার মধ্যেই জানা গেল, সেও অনেকগুলি বিয়ে করেছে। আর সবগুলি বউ তার ঘরে।—সে এক মজার হট্টগোল বানিয়ে রেখেছি জামাই। যেদিন যেটাকে ইচ্ছে হয় কাছে নিয়ে শুই।

তিতুরাম চলতে চলতে শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল। না তার মত শরীর হারায় নি। বেশ শক্ত সমর্থ মজবুত দেহ।

বুঝলে না জামাই, আমি জীবনে এই বুঝেছি, যত পার সুখ করে নাও। তারপর আর কি? তুমি তো জামাই স্বাস্থ্যটাও দেখছি হারিয়েছ।

তিতুরাম লজ্জিত হয়ে শুধু শ্বশুরের দিকে তাকাল।

জগন্নাথ বলল, আহা জামাই লজ্জার কি? তুমি আমার মেয়ের স্বামী হতে পার। কিন্তু বয়েস তো আমাদের এক।

তিতুরাম বলল, আপনার বয়েস কত?

জগন্নাথ ধমকে বলল, কত মানে? তিনকুড়ি তো হতে চলল। তোমার!

ঐ রকম।

তাহলে বলছিলাম কি? আর তো হয়ে এল। এবার ডাক এলেই হয়, বিদায়।

বিদায়টা এমন করে বললো, তিতুরাম চমকে উঠল। তাই তো তাকেও একদিন বিদায় নিতে হবে, আর সেদিনের বুঝি বেশি দেরি নেই।

কিন্তু বিদায় নিলেই কি তিতুরামের বেশি কষ্ট হবে? কষ্ট হবে কিনা একবার মনে মনে পরখ করে নিল। না, কষ্ট হবে। এতদিন যতই কিছু সে অন্যায় করে থাকুক, মরতে সে চায় না। মরার কথা মনে এলেই তার হাত পা কেমন হিম হয়ে যায়।

ও জামাই, কি ভাবছ, দেখে পথ চলো।

তিতুরাম অন্যমনস্ক থাকার জন্যে হোঁচট খেয়েছে, পড়ে যেতে যেতে জগন্নাথ ধরে ফেলল। সামলে নিয়ে তিতুরাম একটু কৃতজ্ঞতার চোখে জগন্নাথের দিকে তাকাল।

জগন্নাথ বলল, আমার মেয়ে এখনও বিধবা হয় নি বটে তবে খুব শিগগির যে হবে এ আমি বলে দিচ্ছি।

তিতুরাম তাকাল জগন্নাথের দিকে।

জগন্নাথ বলল, দেখছ কি? শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? শুধু তো খেটে যাও। কার জন্যে এত খাটো শুনি?

তিতুরাম ম্লান একটু হাসল, মৃদুকণ্ঠে বলল, কই আর খাটি।

তাহলে এই চেহারা কেন? জগন্নাথ রীতিমত ধমকাল।

তিতুরামের ইচ্ছে হল বলে, মনের মধ্যে সুখ নেই। যা চেয়েছিলাম তা তো আর হতে পারি নি। যা চাই নি তাই হয়েছি। কিন্তু এসব গভীর অন্তর্নিহিত কথা শ্বশুরমশাই বুঝবে না, তাই সে চুপ করে রইল।

সত্যি তার একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। কাল সদু থাকতে বলেছিল। সদুর ওখানে থাকলেই হত। ওর আদর যত্ন খুবই ভাল। অন্তর দিয়ে সেবা করে কিন্তু কেন থাকল না সে তো আর অবিদিত নয়। এই সব মেয়েরা সতীলক্ষ্মী। এরা মনে মনে স্বামীকেই কামনা করে কিন্তু··· ।

জামাই, এই আমার বাড়ি, একটু দাঁড়াও খবরটা দিয়ে আসি।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। গাছে গাছে পাখির কল কাকলি শুরু হয়েছে। তিতুরাম তাকিয়ে দেখল, জগন্নাথের বাড়ির দিকে। ঠিক চেনা গেল না। এই বাড়িতেই মামার সঙ্গে কবার এসেছিল একবারও মনে পড়ল না। পাশে পাশে আরও খড়ো—চালের বাড়ি রয়েছে।

হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে এক ঝাঁক নারীকণ্ঠের কান্না ভেসে এল। কান্না কেন?

কিন্তু কান্নাটা বেশ জোরে হতে লাগল, আর তার সঙ্গে কি সব কথা। তিতুরাম কথাগুলি শোনার জন্যে কান পাতল।

আমাদের মেয়ে আবার হল সধবা।
ওরে পোড়ারমুখী মেয়ে,
ওঠ চোখ মেলে দেখ
তোর ভাতার এসে দাঁড়িয়ে আছে, সদরেতে—
তারে বরণ করে নে
ওরে পোড়ারমুখী মেয়ে।'

তিতুরামের মুখের ওপর হাসি ফুটে উঠল। এরা কান্নার মধ্যে ছড়া বেঁধে মেয়ে বরণ করছে। এই সময়ে জগন্নাথ হাসতে হাসতে এসে বলল, শুনছ জামাই, আমার গিন্নীদের গান।

গান! তিতুরামের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ না? আমার এক গিন্নী ভাল ছড়া বাঁধতে পারে।

তিতুরাম যখন গিয়ে উঠোনে দাঁড়াল, এক গলা ঘোমটা দেওয়া দশ বারোটি বউ ছুটোছুটি করে অন্তঃপুরে চলে গেল।

গ্রামে গ্রামে যেমন বিয়ে ব্যবসা নিয়ে বিরাট হট্টগোল। কলকাতাতেও তার ঢেউ লেগেছিল। কিন্তু কলকাতায় বিয়ে ব্যবসার সুবিধা ছিল না।

কে আর কুলরক্ষা করবার জন্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু আলোচনাটা ছিল চায়ের দোকানে, সরকারী অফিসে। বাড়িতে রাগারাগি হলেই মন্মথ তার বৌকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, বৌ, বেশি চালাকি করবে না বলে দিচ্ছি, ঠিক গ্রামে চলে গিয়ে দশ পঁচিশটা বিয়ে করে আসব।

অমনি বৌ মুখ ঝামটা দিয়ে বলত, কর না গিয়ে বিয়ে। মুড়ো ঝাঁটা কি আমার কাছে নেই?

মন্মথ বলত, এত বড় কথা! তুমি আমায় ঝাঁটা মারবে?

বৌও বলত, মারব না, মারব তো! তুমি ঐ সব কথা বলবে কেন?

মন্মথ বলত, তাই বলে ঝাঁটা মারার কথা বলতে পার না।

বৌ বলত, তুমিও ঐ সব বলবে না, আমিও ওসব বলব না।

কিন্তু ঝগড়াটা এখানে থেমে গেলেও মন্মথর মনে মনে বহু বিবাহের ইচ্ছেটা মেলাত না।

মন্মথর মত বিনোদগোপাল, সন্তোষ ভাদুড়ী, হৃষিকেশ মুখার্জি সবারই মনের মধ্যে এক কথা, গ্রামে গিয়ে দু চারটে কুলরক্ষা করে এলে হয়।

এসব ইচ্ছা আরও বেশি জেগে উঠেছিল বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আন্দোলনের প্রভাবে। ওদিকে যত আন্দোলন হয়, আন্দোলনে কিছু হোক না হোক কলকাতার মানুষের মনে বহু বিবাহের ইচ্ছেটা জেগে ওঠে।

এই ইচ্ছেটা বাগবাজারের নবনীধর চাটুজ্যের মনেও জেগে উঠেছিল। তিনি অবশ্য রোজ বিকেলবেলা গিলে করা পাঞ্জাবী, কাল পেড়ে দিশী ধূতি, কানে আতর, চোখে সুর্মা দিয়ে জুড়ি গাড়ি করে নিজের রক্ষিতার বাড়ি যেতেন। সেখানে গিয়ে রাংতা মোড়া পান খেয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে মালাসুন্দরীর কণ্ঠে ঠুংরি বা গজল শুনতেন।

সে দিন কি হল, হঠাৎ তিনি দু' ঘোড়ার জুড়ি গাড়ি থামিয়ে পাশের দরজায় দাঁড়ানো সহিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণ তোর বাড়ি কোথায়?

জুড়ি গাড়িটা দাঁড়াতে নিবারণ ঘাবড়ে গিয়েছিল, হঠাৎ মনিবের প্রশ্ন শুনে আরও ঘাবড়াল।

কি রে কি জিজ্ঞাসা করলাম? নবনীধর ধমকে উঠলেন।

আজ্ঞে আমি তো আপনাদের বাড়িতেই থাকি।

নবনীধর আরও রেগে গেলেন, আবার বললেন—হতভাগা আমি কি তোর বাসার কথা বলছি? তুই যে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে দেশে যাস্ সেই দেশটা কোথায় জিজ্ঞাসা করছি।

এই পথের ওপর জুড়ি গাড়ি দাঁড় করিয়ে হঠাৎ মনিব নিবারণের দেশ সম্বন্ধে কেন এত উৎসাহিত হল, নিবারণ ঠিক বুঝতে পারল না।

নিবারণ বলল, আজ্ঞে হুগলী জেলায়।

নবনীধর বললেন, তুই কটা বিয়ে করেছিস রে ?

নিবারণ বললে, আজ্ঞে একটা।

নবনীধর ধমকে উঠলেন, আবার মিথ্যে কথা ?

আজ্ঞে, আমি তো মিথ্যে বলছি না।

নবনীধর বললেন, মিথ্যে বলছিস না ? এই কোচোয়ান ছপটিটা দে তো ! ব্যাটাকে আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম লাগাই। আমি ওর মনিব ও আমাকে মিথ্যে কথা বলছে।

নবনীধর কোচোয়ানের কাছ থেকে ছপটিটা নিয়ে নিবারণের মুখে চোখে এক চোট ছপটি লাগিয়ে দিলেন। নিবারণ ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

আঁজ্ঞে বাবু, আমি মিথ্যে কথা বলি নি।

নবনীধর একটু পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তোদের দেশের লোক তো সব দশ পঁচিশটা বিয়ে করছে।

নিবারণ বলল, আজ্ঞে সে তো সব বাউনরা।

বাউনরা ? নবনীধর বিড় বিড় করে শুধু উচ্চারণ করলেন।

সেদিন নবনীধর মালাসুন্দরীর বাড়ি গেলেন না। নিজের বাড়িতে চলে এলেন। নিবারণকে বললেন, তামাক সাজ।

নিবারণ তামাক সাজলে ভুড়ুক ভুড়ুক করে টানতে লাগলেন। নবনীধর একটু বিলাসী লোক। সংসারের কোন কিছুর দিকে তাকান না। আলমারী ভর্তি বিলিতী হুইস্কি আছে। বিকেল বেলা সেই হুইস্কি কয়েক পাত্র খেয়ে জুড়ি গাড়িতে উঠে বসেন।

আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে নিবারণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নবনীধর তামাক টানতে টানতে নল সরিয়ে বললেন, তোর বউকে কেমন দেখতে ?

আজ্ঞে সে মোটামুটি।

সুন্দরী ?

নিবারণ একটু ঘাবড়ে গেল। মনিব কি তার বউয়ের ওপর চোখ দিচ্ছে নাকি ? বলল, একেবারে বিচ্ছিরি হুজুর। কাল কুচ্ছিৎ।

নবনীধর বললেন, কে বিয়ে দিয়েছিল ?

আঁজ্ঞে সেই কথাই তো বলছি। বাপ মা আমার গলায় একটা দড়ি বাঁধা কলসী ঝুলিয়ে দিয়েছে।

এসব কথা নিবারণ বলছিল মনিবের কাছ থেকে বৌকে উদ্ধার করার জন্যে। কিন্তু উদ্ধার বোধহয় আর করা গেল না।

নবনীধর হঠাৎ বললেন, তোর বৌকে আনিস তো আমি দেখব কেমন কুচ্ছিৎ দেখতে।

আর বলার সঙ্গে সঙ্গে নিবারণের সব উৎসাহ চলে গেল। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর। কোনদিকে না তাকিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে মনিবের পা দুটি জড়িয়ে ধরল।

নিবারণ বলল, হুজুর, বউ আমার নেই। গত পরশু ভেদবমি হয়ে মারা গেছে।

নবনীধর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন, নিবারণ, জামার পকেট থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে আয়।

মানিব্যাগ এলে একটা দশ টাকার নোট নবনীধর নিবারণকে দিলেন।

নিবারণ বলল, এটা কি করব হুজুর ?

নবনীধর বললেন, এটা তোর বকশিস ?

তাতে আরও নিবারণ ঘাবড়ে গেল, বলল, আমি কি এমন ভাল কাজ করেছি হুজুর যে বকশিস ?

নবনীধর বললেন, কেন তোর বউ ভেদবমি হয়ে মারা গেছে।

সত্যি বিশ্বাস করছেন না ?

নবনীধর আবার একখানি দশটাকার নোট নিবারণের হাতে গুঁজে দিলেন।

আর সেদিনই যে পরামর্শটা হল তারই জের রাখহরি মুখোপাধ্যায়ের কাছ পর্যন্ত এগোল।

রাখহরির সঙ্গে নিবারণের একটু ভাবসাব আছে। এক গাঁয়ের লোক। আর নিবারণ কলকাতায় চাকরি করে। কত কিছু সে দেখে, কত কিছু খায়, রাখহরি কোনদিন কলকাতায় যায় নি, কলকাতা সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য ছিল। তাই নিবারণ দেশে এলে রাখহরির সঙ্গে গল্প করত।

সেদিন নিবারণকে দেখে রাখহরি বলল, তোমার মুখ শুকনো দেখছি কেন নিবারণ, কলকাতার সব ভাল তো ?

নিবারণ বলল, আর ভাল। আমার বোধহয় চাকরি থাকবে না ঠাকুরমশাই।

নিবারণ রাখহরিকে ব্রাহ্মণ দেখে একটু সমীহ করে কথা বলে।

রাখহরি বলল, সে কি ? কেন থাকবে না ? তুমি কি করেছিলে যে চাকরি যাবে ?

নিবারণ বলল, আর করা। আমার কিছু করার কথা হচ্ছে না ঠাকুরমশাই।

কর্তাবাবুর এই বয়েসে স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে। বাবু বিবাগী হয়ে বোধহয় কোথাও চলে যাবে।

রাখহরি চুপ করে রইল, তার বলার আর কিছু থাকল না। কাবুর বাঁচা মরার ওপর তো তার কোন হাত নেই। চুপ করে থেকে বলল, সত্যি এ বাজারে তোমার চাকরিটা যাবে ?

নিবারণ বলল, সেই জন্যেই তো মনটা আমার খারাপ লাগছে।

রাখহরি বলল, তুমি চাকরি করতে। তবু মাঝে মধ্যে দেশে এলে কলকাতার গল্পটল্প শুনতাম। জীবনে তো আর কলকাতায় যাওয়া হবে না।

নিবারণ উৎসাহের সঙ্গে বলল, তুমি ইচ্ছে করলে আমি তোমায় কলকাতা দেখিয়ে আনতে পারি। কলকাতায় কত কিছু দেখবার জিনিষ আছে। সাহেব মেম হাত ধরাধরি করে নাচে। আমিও কত মেমের হাত ধরে নেচেছি।

রাখহরি বলল, তোমার জীবন সার্থক নিবারণ। তুমি যা পার, আমি তা পারি না।

এটা ঠাকুর মশায় তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। তুমি তো ইচ্ছে করলেই, আমি তোমায় কলকাতা দেখিয়ে আনতে পারি।

না থাক নিবারণ। তোমার তো আবার চাকরি যাচ্ছে।

নিবারণ বলল, চাকরি যাচ্ছে বলেই তো আর ছেড়ে দিচ্ছি না।

রাখহরি নিবারণের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবু যাতে বিবাগী না হয়ে যায় সেটাই আমায় দেখতে হবে।

নিবারণ আর কোন কথা না বলে হন হন করে চলে গেল। রাখহরি নিবারণের চলে যাওয়ার পথের দিকে চুপ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুদিন পরে আবার নিবারণের সঙ্গে দেখা রাখহরির। নিবারণ তখন খুব ব্যস্ত।

রাখহরি বলল, শোন শোন নিবারণ এত ব্যস্ত কেন ? কোথায় যাচ্ছ ?

নিবারণ বলল, আমার এখন সময় নেই ঠাকুর মশাই, খুব কাজ। অন্যদিন গল্প করব।

রাখহরি বলল, না না তোমায় গল্প করতে হবে না নিবারণ, শুধু একবারটি শুনে যাও।

নিবারণ বলল, কি তাড়াতাড়ি বলো ঠাকুরমশাই, আমি একদম দাঁড়াতে পারছি না।

রাখহরি বলল, তা যাচ্ছ কোথায় ? এত ব্যস্তই বা কিসের ? তুমি কি আবার কোথাও চাকরি করছ ?

নিবারণ মুখ ভরিয়ে হাসল, বলল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ঠাকুরমশাই। আমি ঐ চাকরি ছেড়ে আবার অন্য চাকরি যোগাড় করব ?

তাহলে কোথায় যাচ্ছিলে ?

বাবু যাতে বিবাগী না হয় তার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলাম।

রাখহরি বলল, তুমি কি তোমার বাবুর জন্যে কোন পাত্রীর ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ ?

নিবারণ বলল, ঠাকুরমশাই ঠিকই ধরেছ ব্যাপারটা। তবে বাবুর জন্যে পাত্রী নয়। বাবুর জন্যে মেয়েছেলে যোগাড় করতে যাচ্ছি।

রাখহরি এসব কথার কোন উত্তর দিলনা। নিবারণ তার বাবুর জন্যে মেয়েছেলে যোগাড় করতে যাচ্ছে। এসব বড়লোকের ব্যাপার। এসব কথায় রাখহরির কাজ কি ?

নিবারণ বলল, বাবুর' তো অনেক টাকা। টাকা ছড়ালে কি না হয়। আমাদের দেশে তো কুলরক্ষায় বহু মেয়ে ব্যভিচারিণী হচ্ছে, তাই ভবানীচরণ চাটুজ্যেকে বললাম, তোমার তো অনেক বউ আছে, দাও না দু'একটাকে দু পাঁচদিনের জন্যে। টাকাও পাবে আর মেয়েটারও হিল্লে হয়ে যাবে। চাই কি বাবুর বাড়িতেই রাজরাণী হয়ে যেতে পারে।

রাখহরি বললে, তা ভবানীচবণ কি বললে ?

রাজি হয়েছে বলেই তো যাচ্ছি।

নিবারণ তখন অনেক দূব চলে গেছে। হঠাৎ রাখহরি তাকে ডাকল, শোন শোন নিবারণ। আচ্ছা তোমাব বাবু এই মেয়েছেলের জন্যে কত টাকা খরচ করবে ?

নিবাবণ বলল, তা মন্দ নয়। কেন ?

না তুমি যদি টাকাব অঙ্কটা বলো আমিই না হয়···

নিবারণ এমনিই ধূর্ত প্রকৃতিব লোক। মাথা নেড়ে জানাল, থাক্ ঠাকুর মশাই, তুমি আর কেন এসবের মধ্যে আসবে।

রাখহরি বিরক্ত হল, বলল, নিবারণ তুমি আমায় টাকার অঙ্কটা বলো না। ভবানীচরণ যে কাজ করতে পাবে আমি পারব না ?

নিবারণ বলল, ঠাকুবমশাই তুমি যদি কাজটা নাও, তাহলে আমি নয় বলে কয়ে বাবুর কাছ থেকে বেশি কিছু পাইয়ে দিতে পারি। তুমি তো আবার আমার জানাশোনা লোক !

রাখহরি বলল, ঠিক আছে, কত টাকা দেবে তাই বলো।

নিবারণ বলল, তুমি কত টাকা পেলে খুশি হবে বলো।

রাখহরি বলল, আমায় হাজার টাকা দিতে হবে।

তখনকার দিনে হাজার টাকার দাম অনেক। নিবারণ চোখ ছানাবড়া করে বলল, ঠাকুরমশাই, তুমি এ কি বলছ ?

রাখহরি বলল, আমি ঠিকই বলছি। খারাপ কাজ করতে পারি কিন্তু টাকা ঐ লাগবে।

নিবারণ বলল, এটা খারাপ কাজ বলছ কেন ঠাকুরমশাই। মেয়েগুলো তো এমনি যার তার সঙ্গে শোয়।

রাখহরি বলল, না ঐ কথাই থাকল। হাজার টাকা লাগবে।

নিবারণ বলল, ঠিক আছে ঠাকুরমশাই তুমি যখন বলছ। তোমায় তো আর না করতে পারি না তবে মেয়েটি যেন বাবুর খুব পছন্দের হয়। সোন্দরপানা মুখ আর সাস্ত। পছন্দ হলেই বাবু টাকা দিয়ে দেবে। আমার বাবু তো মানুষ নয় দেব্‌তা।

নিবারণের সঙ্গে রাখহরির আরও প্রয়োজনীয় কথা হল, তারপর নিবারণ চলে গেল।

রাখহরি তারপর বাড়ি এল। তিতুরামকে আড়ালে ডাকল। তিতু, তোর সঙ্গে খুব গোপনীয় একটা কথা আছে।

তিতুরাম বলল, কি, বলো না ? আবার কোন বিয়ে নাকি ? কিন্তু মামা দেওয়া থোয়ার ব্যাপারটা পাকা করে নিয়েছ তো। দেওয়া থোয়ার ব্যাপারটা পাকা না হলে··· ।

রাখহরি মামা ধমকে উঠল, বলল, তোর কেবল বিয়ে বিয়ে কথা। বিয়ে ছাড়া যেন অন্য ব্যাপার নেই। এটা অন্য ব্যাপার। টাকা উপায় করতে চাস তো ! টাকা !

টাকা জীবনে কে না উপায় করতে চায় ? টাকার জন্যেই তো তিতুরাম শুধু বিয়ে করে চলেছে। মামাও তো ঐ টাকার জন্যেই··· । তাই তিতুরাম বলল, কোথায় টাকা ? মামা বিয়ে ছাড়া অন্য কাজের সন্ধান কিছু পেয়েছ নাকি ?

মামা বলল, সেই কথাই তো বলছি।

কিন্তু মামা যে কথা বলল, তিতুরাম চমকে উঠল। মামা বলল, এত ভাবলে হবে না ! মেয়েটাকে দেখতে ভাল, আমি ওর কথাই ভেবেছি।

মামা যে এতখানি নিচে নেমে যেতে পারে, তিতুরাম ভাবতেই পারে নি।

গুম হয়ে রইল অনেকক্ষণ। মামা বলল, অত কি ভাবছিস ? বিয়ে তো করেছিস দুকুড়ি। একটাকে দিলে কি হয়েছে ?

তিতুরাম বলল, মামা তুমিও তো অনেকগুলি বিয়ে করেছ তা থেকে একটাকে দিয়ে দাও না।

মামা বলল, আমি দিলে তো তোর টাকা হবে না। আমি তো তোর জন্যেই ভেবে ভেবে মরছি।

কিন্তু তিতুরাম আর মামার সামনে দাঁড়াল না। আমায় একটু ভাবতে দাও বলে সরে পড়ল।

জীবনের এসব ঘটনা যেন একটি উপন্যাসের এক একটি রোমাণ্টিক অধ্যায়। তিতুরাম যে এসব পার হয়ে এসেছে ভাবতেই পারে নি। জগদম্বা পাশে শুয়ে আছে। এই এতক্ষণ ধরে পা টিপে, হাত টিপে, বুকে হাত বুলিয়ে, মাথার পাকা চুল তুলে দিয়ে নাস্তানাবুদ করছিল। যত বলে থাক জগো, তুমি শোও। তোমার চোখে ঘুম।

জগদম্বা তবু বলে, না একটু দিই।

আমার ঘুম পাচ্ছে না, আমার খুউব ভাল লাগছে।

জগদম্বা মেয়েটি দেখতে খারাপ। কিন্তু মনটি ভাল। আসার পর থেকে সেই যে স্বামীর সেবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে ছাড়ার নামটি নেই।

ওদিকে ওর মা-রাও ভাল। তিতুরামের সামনে বেবোয় নি বটে কিন্তু দরজার আড়াল থেকে তাদেব চাপা কণ্ঠস্বব ঠিকই শোনা গেছে।

জগন্নাথ বলেছে, জামাই যে কদিন পার তুমি এখানে থেকে যাও। শরীরটা তোমার খুবই কাহিল হয়ে গেছে। একটু সারিয়ে না নিলে···।

বলে হাঃ হাঃ করে হেসেছে জগন্নাথ। জগন্নাথ হেসে তার বউদের ইঙ্গিত করেছে, প্রমোদা, মলিনা আমার স্বাস্থ্যটা কেমন বলো তো?

প্রমোদা, মলিনা দরজার আড়াল থেকে জিভ ভেঙিয়ে চাপাস্বরে বলেছে, আহ! মরণ, মুখের কোন আকঢাক নেই।

আকঢাক সত্যিই জগন্নাথ করে নি। তিতুরামের খাওয়া দাওয়া, বিশ্রাম সবই রাজসিক ভাবে করেছে।

সবচেয়ে তাজ্জব, জগদম্বা বিধবা ছিল। থান পরে, মাথার সিঁদুর তুলে নিরামিষ খেত। ওর মায়েরা মেয়ের সেই সব সাজ ছাড়িয়ে আবার সধবা করল।

জগদম্বা সিঁদুর কৌটো হাতে নিয়ে তিতুরামের সামনে এসে দাঁড়াল।

তিতুরাম জিজ্ঞাসা করল, কি?

জগদম্বা স্নান সেরে চুল এলো করে এসেছে। সিঁথিটা পুরো সাদা। জগদম্বা ইঙ্গিতে সিঁথি দেখাল।

তিতুরাম বলল, সিঁদূর দিয়ে দেব!

জগদম্বা মাথা নাড়ল।

তিতুরাম জগদম্বার সাদা সিঁথি আবার সিঁদূর দিয়ে ভরিয়ে দিল।

জগদম্বা প্রণাম করল।

সেই প্রণাম থেকেই শুরু জগদম্বার সেবা। মোটা আগেই ছিল, এখন মোটা সোটা গিন্নীবান্নীর মত দেখতে হয়েছে। বরং ওর মাদেরই কারও কারও জগদম্বার চেয়ে বয়স কম।

জগদম্বা সধবা হয়ে এক বালতি জল ও সাবান এনে স্বামীর সামনে বসল।

পা দুটো বাড়াও তো।

তিতুরাম পা দুটো বাড়িয়ে দিল। সাবান দিয়ে ঘষে পা দুটো ধুয়ে জগদম্বা ছুটে চলে গেল ঘরের মধ্যে। একটা পাথর বাটি এনে তিতুরামের পা দুটি আবার ধুয়ে তার মধ্যে জল রাখল।

তিতুরাম বলল, এসব কি করছ ?

জগন্নাথ ওপাশের দাওয়ায় বসে তামাক টানছিল। বলল, জামাই, মেয়েকে আমি বাজে শিক্ষা দিই নি। তোমার তো আরও অনেক স্ত্রী আছে, এর মত কি পাবে ?

তা সত্যি কথা, পাদোদক খেয়েছে এমন স্ত্রী তিতুরামের খুব কমই আছে।

তিতুরাম বললো, জগো, ওসব খেও না। পায়ে কত ধুলোবালি লেগে থাকে।

জগদম্বা বলল, ঐজন্যে তো সাবান দিয়ে ধুয়ে নিলাম।

জগন্নাথ বলল, থাক থাক। স্বামীর পুণ্যে সতীর পুণ্য। আমার বউরা কি কম পায়ের জল খায় ? রোজ সকালে উঠে আমায় এক গামলা জলে পা ডোবাতে হয়। কারুর যদি একটুও কম পড়ে অমনি সে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তোলে। তার ওপর নানান পালা-পার্বণ তো আছেই। সেদিন গামলা গামলা পাদোদকই আমায় সাপ্লাই করতে হয়। বৌয়েরা তো আর কিছু খায় না।

তিতুরাম বলল, শ্বশুরমশাই, আছেন ভাল।

জগন্নাথ বলল, থাকব না কি টেঁসে যাব ভেবেছ ? সবই আমার ভাল, শুধু আমার বৌয়েরা কেউই আমার তাড়ি খাওয়া পছন্দ করে না। তাড়ি খেলেই আমায় ঐ গাছতলায় পড়ে থাকতে হয়।

তা খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালই হল। আয়োজন মন্দ হল না। নতুন কাপড় নতুন গামছা দিল শ্বশুর মশাই। পুরানো কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

স্নান-টান সেরে সেই নতুন কাপড় পরে গামছা গায়ে দিয়ে তিতুরাম খেতে বসল।

পরিবেশন করল সবই জগদম্বা। শুধু ওর মা-রা অন্তরাল থেকে রান্না ব্যঞ্জনাদি এগিয়ে দিতে লাগল।

আরামের চোটে ঘুম এসে গিয়েছিল তিতুরামের। হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে তাকিয়ে দেখল।

জগদম্বা তাকে পান দিচ্ছে। জগদম্বা জিব কেটে বলল, একদম ভুলে গেছিলাম। ছোটমা বলল বলে মনে পড়ল। তুমি কিছু মনে কর নি তো ?

তিতুরাম সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, তোমার মা ক'টি ?

জগদম্বা চুপ।

তোমার বাবা এখনও বিয়ে করে ?

জগদম্বা বলল, এই তো ক'মাস আগে ছোটমাকে বিয়ে করে আনল।

আমি কতগুলি বিয়ে করেছি জানো ?

জগদম্বা তাড়াতাড়ি কানে আঙুল দিয়ে বলল, পতির নিন্দা শুনতে নেই।

আমি তো করছি।

জগদম্বা ততক্ষণে তিতুরামের পা নিয়ে টিপতে শুরু করেছে। তিতুরাম তাড়াতাড়ি বলল, একি একি ?

জগদম্বা বলল, পা দুখানি কি হয়েছে দেখেছ ?

তিতুরাম বলল, এটাও কি তোমার মায়েরা শিখিয়ে দিয়েছে নাকি ?

জগদম্বা বলল, না। আমার মা-রা আমায় কিছুই শেখায় নি।

কিন্তু তিতুরাম ভাবছিল জগদম্বা কখন তার পাওনাটা চাইবে। সেই ভয়ে সে পা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে রইল। কিন্তু যখন জগদম্বা পা হাত টিপতে টিপতে হাই তুলতে লাগল, তিতুরামের চেতনা ফিরল। তিতুরাম বলল, জগো শুয়ে পড়ো।

সাড়া পেতে জগদম্বা তাড়াতাড়ি আবার সচেতন হয়ে উঠল। নড়ে চড়ে বসল। বলল, না আমার ঘুম পায় নি।

তিতুরাম বলল, স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ঘুম পেয়েছে।

জগদম্বা বলল, ওটা আমার স্বভাব। দুপুরবেলা তো কোন কাজ থাকে না। মায়েরা ঘুমোয়, অগত্যা আমিও ঘুমোই।

সেই জন্যে তো বলছি তুমি শুয়ে পড়।

জগদম্বা বলল, আর একটু পা-টা টিপি তারপর শোব। কিন্তু জগদম্বা ঐ পা টিপতে টিপতেই তিতুরামের পায়ের ওপর ঢলে পড়ল। তিতুরাম সেই ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। এই রকম মেয়ে যেন সে অনেক দেখেছে। এমনি সেবাপরায়ণা মূর্তি। ওরা স্বামীর কাছে কিছু চায় না। শুধু স্বামীকে সেবা করতে চায়। স্বামীকে সেবা করেই যেন তারা পরমার্থ লাভ করে। কামনা বাসনায় কাতর মেয়েও যেমন তিতুরাম দেখেছে, তারা স্বামীকে পেলে বাঘের মত লাফিয়ে পড়ে। তেমনি শান্তশিষ্ট কোন চাহিদা নেই, স্বামীর সান্নিধ্য পেলেই তারা বর্তে যায়। এই সব মেয়েদের প্রতিই যেন গোপন স্নেহ অনুভব করে তিতুরাম।

পায়ের কাছ থেকে তুলে জগদম্বাকে নিজের পাশে শুইয়ে দিল তিতুরাম। জগদম্বা একবার চোখ মেলে তাকাল, কি পরম নিশ্চিন্তে একহাত স্বামীর গায়ে মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে।

হেমা বদরাগী ছিল, স্বামীর ওপর খুশি ছিল না কিন্তু কোনদিন খারাপ কিছু

কথা তার নামে শোনা যায় নি। স্বামী অনেক বিয়ে করেছে জেনেও সেও কখনও স্বামীর ওপর রাগ করে অন্য পুরুষকে কাছে টানে নি।

আর টানে নি বলেই তিতুরামের সব চেয়ে কষ্ট হয়েছিল হেমার জন্যে।

হেমা তার প্রথম যৌবনের ভালবাসার পাত্রী। তার সঙ্গে একদিনও রাত্রিবাস করতে পারে নি।

তাই যখন মামা হেমার কথাই বললো তখন সবচেয়ে আঘাতটা সেই পেয়েছিল।

মামা ওর কথা কেন বললো? তিতুরাম তো তখন অনেকগুলিই বিয়ে করেছিল। সুন্দরীও তার মধ্যে অনেকে ছিল।

দু'তিন দিন তিতুরাম মামার সঙ্গে কথাই বলল না। মামা তাকালেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মামা না থাকলেই সে বাড়ি আসে। এইভাবে চলল দু'তিন দিন। তারপর একদিন মামাই বলল, কি রে কি ভাবলি?

তিতুরাম বলল, আমি এখনও কিছু ভেবে ঠিক করতে পারি নি মামা।

মামা বলল, অত ভাবার কি আছে? হেমাকে কলকাতা দেখাবার নাম করে নিয়ে চ, তারপর পথে হারিয়ে গেছে বললেই হবে। আমি তো শিবনাথকে জানি, সে আপদ গেছে বলে আর খুঁজবে না।

সে সময়ে মেয়েদের ওপর বাড়ির এই রকমই ভাব ছিল। মরে গেলেই তারা নিশ্চিত হত কিন্তু তিতুরাম হেমার সম্বন্ধে ওসব ভাবতে পারল না।

তিতুরাম বলল, মামা অন্য মেয়ে দিলে হবে না!

মামা বলল, কোন্ মেয়ে।

তিতুরাম বলল, এই ধর মালিনী বা এলোকেশী।

মামা বলল, পাগল, তুই ভেবেছিস কি তিতু? হাজারটা টাকা যে দেবে সে ঐরকম মেয়ে নেবে?

মামা কেন যে হেমাকেই নির্বাচন করল, তিতুরাম ভেবে পেল না। হেমার ওপর মামা প্রথম থেকেই খুশি নয় সেটা তিতুরাম জানে। কিন্তু তাই বলে হেমার এমনি সর্বনাশ!

তিতুরাম বলল, মামা আমার টাকা চাই না। তুমি অন্য ব্যবস্থা কর।

মামা রেগে গেল, বলল, বেশ, আর আমাকে কোন কথা বলবি না। আর টাকা টাকাও করবি না। আমি তোর আর কোন ব্যাপারেই থাকব না।

তিতুরাম মুস্কিলে পড়ে গেল। মামা যদি এখন বেঁকে যায়, তাহলে আর ব্যবসা হবে না। আর ব্যবসা না হলে রোজগারও বন্ধ হয়ে যাবে। তবু তিতুরাম আরও কদিন ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার মাথা খারাপ হয়ে যেতে লাগল।

ওদের এই মামা ভাগনের শলাপরামর্শটা মার কানে গেল। মা জিগ্যেস করল, তিতু তোরা মামা ভাগ্নে দিনরাত কিসের শলাপরামর্শ করছিস্ রে!

তিতুরাম বলল, তুমি সব কথায় কান দিও না মা। ও আমাদের অন্য ব্যাপার।

মা বলল, আহা অন্য ব্যাপার তো বুঝতেই পাচ্ছি কিন্তু কি ব্যাপার তাই জিজ্ঞাসা করছি।

তিতুরাম চুপ।

এখনও যেমন সমাজ বলে কিছু নেই, তখনও সমাজ বলে কিছু ছিল না। কিন্তু সমাজে কুসংস্কার ছিল। এই কুসংস্কারই সমাজ ভাঙাবার মুলে চরম। সমাজের এমন কতকগুলি গোলমেলে ব্যাপার ছিল যেগুলি মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসত। অথচ দেশের মান্যগণ্যরা এই সর্বনাশকেই সমর্থন করত। গঙ্গায় শিশু ভাসানো, সহমরণ প্রথা, বাল্য বিধবা, বিধবারা যাতে কঠোরভাবে বৈধব্য জীবন যাপন করতে পারে সেই দিকে সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। তারপর বহু বিবাহ।

ক্রমে ক্রমে এই সব কু-প্রথার মুলোচ্ছেদের জন্যে কিছু ব্যক্তির আগ্রহ জাগল কিন্তু তা স্থায়ী হল না।

লাটসাহেবের কাছেও আবেদন গেল, লাটসাহেব বললেন, তোমাদের সমাজের ব্যাপার, আমি শেষকালে হাত দিয়ে কি ইংরেজ সরকারের বিরাগভাজন হব ?

কিন্তু লক্ষ্য করবার মত একটা ব্যাপার। বেছে বেছে মেয়েদের সর্বনাশ করবার জন্যেই যেন প্রথাগুলি।

মেয়েরা অবলা, প্রতিবাদের ভাষা তাদের নেই। কিন্তু নিজেদের ধ্বংস করবার ক্ষমতা তো তাদের আছে! সে ধ্বংসের খেলায় তারা মেতে উঠল।

বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিবাহ একটা তাদের হত বটে কিন্তু ঐ সিঁথিতে সিঁদুর হাতে শাখা ব্যস। ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়াও নিজের চেনা গণ্ডিটুকুর মধ্যে।

কিন্তু সব মেয়ে তো এক নয়, আর সব মেয়ের স্বভাবও এক নয়। মেয়েদের মনে লোভ জাগাতে লোকেরও অভাব নেই। এই প্রথাই পরোক্ষভাবে মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুললেও তবু কেউ এই নিয়ে ঘোট পাকাত না। ব্যাপারটা ডাল ভাত হয়ে গিয়েছিল।

বাপ-মা চাপা দেবার চেষ্টা করত। গর্ভবতী মেয়েকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখত। মেয়েকে বলত কি করেছিস পোড়ামুখী ? গলায় দড়ি দিতে পারিস নি ?

মেয়ে বলত, এ কি শুধু আমার দোষ আমি কি করব বল। বাপ-মা চুপি চুপি অন্য গ্রাম থেকে দাই ডেকে নিয়ে আসত। তারপর বাপ মা-ই ভ্রূণটার গলা টিপে জঙ্গলে পাচার করে দিত।

এমনি কত ভ্রূণ যে জন্ম নেবার আগে বা পরে পৃথিবীতে আসতে পারত না, তার আর ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু তবু এই ভাবেই চলে আসছিল। বরং কোন মেয়ে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে পথে ঘাটে কোন পুরুষের সঙ্গে কথা না বললে অন্য যুবতী মেয়ে তাকে বলত, এই তোর কি হল রে?

সাবিত্রী বলত, কি?

সাবিত্রী অপরূপ সুন্দরী মেয়ে, মাটিতে পা পড়ে না তা নয়। সাবিত্রীর স্বভাব একটু গম্ভীর। আর অন্য মেয়েদের মত বাচালতা তার পছন্দ নয়। সাবিত্রী বলত, আমি তো কুমারী নয় যে মিশব? আমার তো স্বামী আছে।

হ্যাঁ, ও স্বামী তো তোর জন্যে মরে যাচ্ছে! আমারও তো স্বামী আছে। তাই বলে কি কৃষ্ণগোপালের সঙ্গে মিশি না। কৃষ্ণগোপাল আমার জন্যে হাট থেকে কত জিনিস এনে দেয়। এই যে ডুরে শাড়িটা পরে আছি দেখছিস এটা কৃষ্ণগোপাল এনে দিয়েছে। কৃষ্ণগোপাল শুধু শাড়ি দেয় নি, রুপোর কাঁটা, লাল নীল কাচ পোকার টিপ ধুনোর আটা করে পরি। দেখবি কৃষ্ণগোপালের সঙ্গে একদিন পালিয়ে যাব।

কিন্তু সাবিত্রীর এসব ভাল লাগে না। তার মনে হয় এ অন্যায়, এ পাপ। সত্যচরণ তাকে ভালবাসে বটে একদিন বনের মধ্যে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সাবিত্রীর রাগ হয়েছিল বটে কিন্তু ভালও লেগেছিল। সত্যচরণ তাকে অনেক কিছু দিতে পারে। তবু এ পাপ।

এমনি পাপের চিন্তা বহু মেয়ের ছিল। এমনি পাপের চিন্তা নিয়েই মেয়েগুলি একদিন আত্মহত্যা করত।

সেই আত্মহত্যাই কি বহুদিন আলোড়ন জাগিয়ে রাখত? তা নয়, আবার সব সহজ হয়ে যেত আবার আগের মত জীবন এগিয়ে চলত। শুধু বৌ-ঝিরা পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মধ্যে আলোচনা করত, আহা মেয়েটা সতী লক্ষ্মী ছিল। স্বামীর ঘর করতে পারল না বলে আত্মহত্যা করল।

ঐ আহাটুকুই পুকুরধারে আলোচনা হত, তারপর যে যার কাজকর্ম করে, ঘড়া ভর্তি জল নিয়ে ভিজে কাপড়ে ছপ্ ছপ্ করতে করতে চলে যেত।

কিন্তু আত্মহত্যা অন্য কারও মনে না বাজলেও মেয়ের মার মনে বাজত।

তাই মনমরা মেয়েকে মা আগেই সাবধান করে দিত, ওরে খুকী, অত মনমরা হয়ে থাকিস নে? হেসে খেলে ঘুরে বেড়া না।

হাসি তো অত সহজ নয়। হাসি বললেই আর হাসা যায় না। একটি যুবতী মেয়ের যৌবনের যে বেদনা অন্যে কে বুঝবে? আর বুঝলেও প্রতিকার কি? প্রতিকার তো কিছু নেই। পেশাদার বর যদিও বা আসে সে ঘণ্টা ধরে আসে। তার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিতে মন চায় না আর হেমা তো তার বরকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল। তার ঘৃণা হয়েছে ঐ বরের কাছে যেতে।

তবু হেমা মনমরা হয়ে ঘোরে, এর জন্যে ওর মার মন খারাপ হয়ে যায়। হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো!

মা বলে, হেমা হেসে খেলে বেড়া না!

হেমা বলে, কি করে হাসব?

. মা বলে, কেন হাসতেও কি ভুলে গেছিস? আগে তো কত হাসতিস!

হেমা ছোটবেলায় খুব হাসত। হাসির চোটে ওর বাবা মা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। তারা বলত, হেমা হাসি থামা। মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

হেমা বলত, বাহ্ হাসি পেলে হাসব না! আমার যে ভীষণ হাসি পাচ্ছে।

সেই হেমা হাসতে ভুলে গেছে। মা হাসতে বললে সে হাসতে পারে না। তার হাসি আসে না।

মায়ের প্রাণে ব্যথা বাজে। মা বলে, জামাইকে আসতে খবর পাঠাই।

হেমা বলে, না।

মা বলে, তাহলে অন্য কারও সঙ্গে মেশ। গ্রামে তো কত ছেলে রয়েছে।

হেমা অবাক হয়ে মার দিকে তাকিয়ে থাকে। মা যে এমন কথা বলতে পারে সে ভেবে পায় না।

মা বলে, অমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?

হেমা বলে, তুমি আমায় ব্যভিচারিণী হতে বলছ?

মা ইতস্তত করে বলে, এ আর নতুন কথা কি? সব মেয়েরাই এসব করছে। তাই বলে কি তুই মারা যাবি? মার ভয়, মেয়ে এমনি মনমরা হয়ে হয়ে একদিন না শুকিয়ে মরে যায়।

কিন্তু হেমা অন্য কারোর সঙ্গে মিশতে গেলে পাপ বলে মনে করে। তিতুরামের সঙ্গে মেশে না যেমন তার বহু বিবাহকে ঘৃণা করে, তেমনি অন্য পুরুষদের সঙ্গে মিশতে গেলে তার সঙ্কোচ উপস্থিত হয়।

হেমা বলে, না হাতটা ছেড়ে দাও। কালিপদ বলে, তোমার হাতটা কি সুন্দর? এত ভাল হাত আমি জীবনে দেখিনি। হেমা আমি তোমায় ভালবাসি।

হেমার মুখে হঠাৎ খারাপ কথা এসে যায়, বলে, তোমার ভালবাসার মুখে আগুন। পথ ছাড়।

কালিপদ তবু পথ ছাড়ে না। পথ আগলে রাখে। হেমার দেহের দিকে তাকিয়ে তার পলক পড়ে না।

হেমা লক্ষ্য করে বলে, কি দেখছ ? কালিপদ বলে, তোমার শরীর। আমি জীবনে এমন শরীর দেখিনি।

হেমা কালিপদর গালে চড় কষিয়ে দিতে যায়। কিন্তু কালিপদ চড় খেয়েও হেমাকে জাপটে ধরে। তারপর দুজনে এক চোট ধস্তাধস্তি হয়। হেমা যখন ছাড়া পায় তখন শাড়িখানা মাটিতে লুটচ্ছে। কালিপদ নেই।

হেমা শাড়ি পরে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি আসে। মা জিজ্ঞাসা করে, হেমা কাঁদছিস কেন রে ?

হেমা উত্তর দেয় না ! শুধু কেঁদেই চলে। মা আবার বলতে রেগে গিয়ে বলে, আমার জীবনটা তোমরা তচনচ করে দিলে। আমি যা চাই না, তাই যদি আমার জীবনে ঘটে তাহলে কি করা যায় ?

মা বলে ব্যাপারটা কি হয়েছে বলবি তো ? শাড়িটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। পড়ে গিয়েছিলিস ? কোথায় লেগেছে, আয় একটু চুন হলুদ দিয়ে দিই।

হেমা চুপ করে থাকে। শাড়ি বদলাবার কথা মনে থাকে না। হাঁটুতে চুন হলুদ দেবার কথা মনে থাকে না। সে শুধু ভাবতে থাকে, আমার কি হবে ? আমি কেমন করে জীবন কাটাব।

এদিকে তিতুরামও ভাবছিল, সে হেমার কাছে এ প্রস্তাবটা কেমন করে করবে ? হেমা তো তাকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। অবশ্য একটা ভাল মতলব মামা বাতলেছে। হেমাকে যদি বলা যায়, চলো কলকাতায় যাই, তাহলে ঠিক রাজি হয়ে যাবে। কলকাতায় যেতে কোন মেয়ে না চায়। যখন সে কলকাতার এত নাম।

ঠিক তাই হল। হেমাতো প্রথমেই তাকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। আবার এসেছ কেন ? কি মনে করে ? আবার কি বিপদ ?

হেমার মা বলল, এ কি হেমা এইভাবে জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে আছে ? কতদূর থেকে এসেছে। পায়ে জল দে, পা ধুয়ে দে।

হেমা বলল, ঐ দাওয়ায় তো জল আছে। ধুয়ে নিক্ না।

মা তাড়াতাড়ি ছুটল জামাইয়ের জন্য খাবার আনতে ! তিতুরাম বলল, কই আমায় বসতে বললে না।

হেমা বলল, আমি কি তোমায় বসতে মানা করেছি ! ঘর তো খোলা আছে গিয়ে বসো না।

তুমি এমন করে কথা বলছ কেন ? আমি আসায় তুমি খুব খুশি হও নি ?

হেমা চুপ করে রইল।

কই ঘরে চল। কত দিন পরে দেখা।

হেমা তিতুরামের পেছন পেছন ঘরে এল। হেমা বলল, বলো, কি বলবে?

তিতুরাম বলল, কাছে এসে বস। দূর থেকে বুঝি বলা যায়?

হেমা বলল, কাছে যাওয়ার কি দরকার? বলো না কি বলতে চাও?

তিতুরাম বলল, তুমি দেখছি আমায় প্রথম থেকে সহ্য করতে পার না।

হেমা মুখ ঘুরিয়ে বলল, এই কথা বলতেই কি তুমি এত পথ এসেছ?

তিতুরাম বলল, এ কথাটার কি কোন গুরুত্ব নেই? আমি তোমায় কত ভালবাসি!

ভালবাসার কথাটা শুনে হেমা হঠাৎ গাম্ভীর্যের মুখোস খুলে জোরে জোরে হেসে উঠল। কালিপদও ভালবাসার কথা বলে, তিতুরামও বলছে। হেমা হাসতেই তিতুরামের একটু সাহস হল, অমনি আসল প্রস্তাবটা দিয়ে দিল।

হেমা বলল, আমি রাজি। কবে যাবো বলো? মাকে বলব?

তিতুরাম বলল, মাকে বলতেও পার, আবার নাও বলতে পার।

কিন্তু হেমা দাঁড়াল না, উড়ন্ত ফড়িঙের মত ডানা মেলে ছুটে চলে গেল। ফিরে এল কয়েক মিনিট পরে। এই নাও তোমার খাবার। রাত্রে থাকবে তো!

তিতুরাম বলল, সেটা তোমার ইচ্ছে।

হেমা বলল, ইচ্ছে টিচ্ছে বুঝি না! থাকবে তো বলো। হেমা বলছিল বটে কিন্তু মিটি মিটি হাসছিল।

তিতুরাম এতখানি খাতির পাবে সে ভেবে পায় নি। এই কলকাতা যাবার প্রস্তাবে যে হেমা এত খুশি হবে তার অজানাই ছিল।

সেই রাত্রে তিতুরাম থেকে গেল। আর প্রথম পাওয়া স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার বুকের রক্ত শুকিয়ে যেতে লাগল। হেমাকে সে হায়নার মুখে ছেড়ে দেবে? হেমাকে যে সে ভালবাসে।

তিতুরামের চোখে জল দেখে এক সময় হেমা বলল, ওমা তুমি কাঁদছ কেন?

তিতুরাম বলল, না তো!

হেমা বলল, তোমার চোখে জল দেখছি! আর তুমি বলছ কাঁদছি না।

তিতুরাম বলল, এ আমার আনন্দাশ্রু। তোমায় আজ পেয়েছি, তাই চোখে জল আসছে।

হেমা তিতুরামের চোখ থেকে আঁচল দিয়ে জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, তুমি আমায় এত ভালবাস জানতাম না তো!

তিতুরাম হঠাৎ চমকে উঠল, জগদম্বা উঠে বসেছে। তাড়াতাড়ি জগদম্বাকে শুইয়ে দিতে গেল, সে শুল না, হাত সরিয়ে দিয়ে পা টিপতে লাগল।

তিতুরাম বলল, থাক তোমায় আর পা টিপতে হবে না।

জগদম্বা বলল, না আর একটু সেবা করি, তুমি তো খুব ক্লান্ত।

তিতুরাম বলল, আমি ক্লান্ত তুমি বুঝলে কেমন করে? আমি তো বেশ ভাল আছি।

জগদম্বা কিছু বলল না, শুধু স্বামীর দিকে এক দৃষ্টিতে একটু করুণ চোখে তাকিয়ে আবার পা টিপতে লাগল।

তিতুরাম মনে মনে একটু হাসল। জগদম্বার মনে যে কথাটা এসেছিল সেটা বলল না দেখে সে চুপ করে রইল। এই সব মেয়েরা স্বামীকে এত ভালবাসে যে স্বামীর কোন দুর্নামই তারা গাইতে নারাজ। ওর খুব ভালো লাগল জগদম্বার এই স্বভাবে। এমনি মেয়ের স্বভাবই যেন তিতুরাম মনে মনে চায়। এমনি পতিপ্রাণা স্ত্রী যেন তার কাম্য।

কিন্তু তাই কি সব ক্ষেত্রে হয়? সবাই কি জগদম্বা? তাহলে পৃথিবীতে এত গোলমাল কেন? এই সময়ে বাইরে থেকে দরজায় মৃদু করাঘাত হল।

জগদম্বা তাড়াতাড়ি উঠে তিতুরামের পায়ের ওপর দু'হাত জোড়া করে মাথাটা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল।

আমি যাচ্ছি। জগদম্বা বলল।

তিতুরাম বলল, এস।

দরজা খুলতেই দেখতে পেল জগদম্বার ছোটমাকে।

ছোটমা জগদম্বার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। কত হবে বয়েস? বছর আঠারো! মাথায় ঘোমটা ছিল, মুখে ছিল না, মুখখানি কচি কচি। বেশ ভালই দেখতে। ফর্সা দোহারা চেহারা। বড় বড় চোখ ঝিকিয়ে ঠোঁটে হাসি টেনে ফিসফিসিয়ে বলল, জামাই ঘুমিয়েছে?

জগদম্বা কি যেন বললো।

আমি ডাকলুম, তুমি কিছু মনে করনি তো!

একথা কেন বলছ ছোট মা? জগদম্বার মুখ লাল হয়ে উঠল।

না বলছি অনেকদিন পর তো জামাই এসেছে। আবার ডেকে তোমার অভিসম্পাত না কুড়োই।

জগদম্বা ছোটমার মুখটা চেপে ধরল। তারপর ওরা সরে গেল।

এসব মেয়েলি রসিকতা বরাবর সব মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়। ওরা যেন এই স্থূল রসিকতা ছাড়া আর কিছুই জানে না। এই ওদের জীবন, এই ওদের আলোচনা। এই আলোচনাই তিতুরাম এই বয়স পর্যন্ত দেখে আসছে। এই অল্প পাওয়ার মধ্যেই ওদের যেন সৃষ্টি।

তিতুরাম যে ভাবে এই মেয়েদের বুঝেছিল মামা বোঝেনি। মামা যেন মেয়েদের ব্যাপারে নির্মম।

তিতুরাম যখন বলল, মামা হেমা রাজী হয়েছে।

মামা যে-ভাবে উল্লাস প্রকাশ করল মা বেরিয়ে এল। মা জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে দাদা? অত আনন্দ কিসের?

মামা বলল, তুই গিরি সব কথায় আসিস কেন বল তো?

মার মুখ শুকিয়ে গেল, মা বলল, আমি কি খুব অন্যায় করেছি।

মামা বলল, হ্যাঁ, অন্যায় করেছিস? আর কখনও আমাদের কথায় ছুটে আসবি না। আমাদের বলে মামা ভাগনেতে একটা পরামর্শ হচ্ছে।

মার মুখের দিকে তাকিয়ে তিতুরামের খুব কষ্ট হল। ওর ইচ্ছে হলো বলে, মাকে সব কথা। মা যে কি বলবে সে জানে। কিন্তু কাজটা কি সে ভাল করতে যাচ্ছে? তবে আর ভবিতব্য কাকে বলে।

মা চলে গেলে মামা বলল, তাহলে ঐ কথা থাকল। অমুক দিন তুই হেমাকে নিয়ে চলে যাবি। তারপর নিবারণ যা করার করবে।

এক-একটা যুগ আসে এক এক সময়ে। সে যুগে ভালমন্দর বিচারটা কেউ করেনা। শুধু পাওয়ার দিকেই লোভ থাকে। বিদ্যাসাগর মশাই মাথা ফাটিয়ে ফেলছেন যখন মেয়েদের ভাল করবার জন্যে, তখন মেয়েদের রসাতলে দেবার জন্যে এই বাংলাদেশ উঠে পড়ে লেগেছে। সবারই লক্ষ্য মেয়েগুলিকে নিয়ে লোফালুফি খেলা। সে শিক্ষিত অশিক্ষিত বলে কোন বাছ-বিচার নেই। অশিক্ষিতরা স্পষ্ট, সোজাসুজি চায়, শিক্ষিতেরা একটু ভড়ং-এর আশ্রয় নেয়। যেমন মন্মথ। মন্মথর বহু বিবাহের দিকে ঝোঁক আছে। সে ব্রাহ্মণের ছেলে কিন্তু কলকাতায় থাকে। কলকাতার ইংরেজ ফার্মে চাকরি করে। কিন্তু ওর মন গ্রামের দিকে পড়ে থাকে। বৌকে মাঝে মাঝে অনেক বিয়ে করব বলে রাগায় বটে কিন্তু আসলে ওর মনের মধ্যে বহু বিবাহের দিকে। কারণ ও যে ব্রাহ্মণ। ওর জাত ভাইরা যখন মজা লুটছে, ও না লুটে পারে? একদিন অফিসের এক কলিগের সঙ্গে ব্যবস্থা করে তার গ্রামে গিয়ে এক গরীব ব্রাহ্মণের কুলরক্ষা করে শান্ত হল না, বৌকে সঙ্গে করে কলকাতার বাসায় নিয়ে এল।

শ্যামা দেখে বলল, এ কে?

মন্মথ বলল, তোমার বোন।

শ্যামা বিস্মিত হয়ে বলল, আমার তো কোন বোন ছিল না। আমি তো বাপ-মায়ের এক মেয়ে।

মন্মথ বলল, স্বামীর বৌ তোমার কি হবে? বোন হবে না!

শ্যামার মুখ ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু সে বেশীক্ষণ নয়। ছুটে গিয়ে ঘর থেকে ঝাঁটা নিয়ে এল।

শ্যামা বলল, আমার বোন, তবে ঝেঁটিয়ে বোনকে বিদেয় করি।

নতুন বৌ ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিল, গায়ে ঝাঁটা পড়তে লাফিয়ে উঠল।

মন্মথ বলল, কি করছ, কি করছ, শ্যামা ক্ষান্ত হও!

শ্যামা বলল, তুমি ঐ হতচ্ছাড়ীকে নিয়ে এখুনি বিদেয় হও। আমি তোমাদের মুখ দেখতে চাই না। তুমি সত্যিই বিয়ে করে এলে? শ্যামা কাঁদতে লাগল।

মন্মথ বলল, শ্যামা কেঁদো না, ব্যাপারটা শোন।

শ্যামা মাথা নেড়ে বলল, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তোমায় আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি. আমি সতীন নিয়ে ঘর করতে পারব না।

মন্মথ বলল, সেই কথাই তো বলছি। আমি জানি, তুমি সতীনকে ঘৃণা কর কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে একটু শোন তো। তারপর যা বিচার হয় করো।

শ্যামা বলল, আমি কোন কথা শুনব না। তুমি তোমার নতুন বৌ নিয়ে বিদেয় হও।

মন্মথ রেগে গেল, বলল, আমি চলে গেলে তোমার কি করে চলবে?

শ্যামাও রেগে গিয়ে বলল, আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। কলকাতার গঙ্গায় কি জল নেই?

মন্মথ যে কত বড় ভাল কাজ করেছিল, সে কথা শ্যামাকে বোঝাতে চাইল। মন্মথ বলতে গেলেই শ্যামা মাথা নাড়ে, আর চোখ দিয়ে জল ঝরায়। শেষে শ্যামা বলল, বলো, তুমি কি বলতে চাও? আমি তো অনেকদিন বুঝতে পাচ্ছি, তোমার মাথায় ভূত চেপেচে। আর আমার কপাল পুড়েছে।

মন্মথ বলল, শুধু তুমি রাগ করছ? তুমি আমার বড় বৌ। তোমার স্থান সবার ওপরে।

শ্যামা বলল, থাক, অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই। কি বলতে চাইছ বলো।

মন্মথ বলল, মেয়েটি বড় গরীব। ওর বাবা ভীষণ ধরলো। আর আমাদের জাতে কুলরক্ষার তো একটা রেওয়াজই আছে।

শ্যামা বলল, তোমার জাতের মুখে আগুন। বেশ করেছ এখন বিদেয় হও।

শ্যামা আর কথা বলতে পারল না, ঝাঁটাটা ফেলে দিয়ে বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। নতুন বৌ এগিয়ে এল। নতুন বৌয়ের খুব কষ্ট হল। নতুন বৌ শ্যামার হাত ধরে বলল, দিদি আমি যদি চলে যাই তুমি খুশি হবে তো!

শ্যামা নতুন বৌয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না। ঠ্যালা দিয়ে বলল, সরে যাও। আমাকে ছুঁয়ো না। কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

সরল মুখখানি, চোখ দুটি জলে টলমল করছে। শ্যামার মনটা করুণ হয়ে উঠল। বলল, তুমি কাঁদছ কেন ?

টগর এবার আরও জোরে কেঁদে উঠল। বলল, আমি এসে তোমার মনে দুঃখু দিলাম। তুমি কষ্ট পাচ্ছ ? এখানে কলকাতার গঙ্গা কতদূর দিদি ?

দিদি বলল, কেন, কলকাতার গঙ্গায় তোমার কি কাজ ?

টগর বলল, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আমি গঙ্গায় ডুবে মরব।

শ্যামা তাড়াতাড়ি টগরকে বুকে জড়িয়ে ধরল। টগরকে নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে শ্যামা কেমন যেন আরাম অনুভব করল। ওদিকে হাসতে হাসতে তখন মন্মথ অন্যত্র চলে গেল।

শ্যামা বলল, নে ছোট ওঠ। কাপড় জামা ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে কিছু মুখে দিয়ে নে। অনেক পথ তো আসতে হয়েছে।

টগর বলল, তুমি রাগ কর নি তো দিদি ? তুমি যদি রাগ কর, তাহলে আমায় গঙ্গায় পাঠিয়ে দাও।

শ্যামা বলল, বেশ দেবো কিন্তু আমি যা বলব সব সময় আমার কথা শুনবি তো ?

টগর বলল, আমি না শুনলে আমায় মারবে দিদি। তবু আমায় তাড়িয়ে দিও না। ঐ বাপের বাড়িতে গেলে আমি আর বাঁচব না।

শ্যামা বলল, কেন রে ?

টগর বলল, আমরা যে খুব গরীব দিদি।

শ্যামা বলল, ঠিক আছে কিন্তু তুই স্বামীর কাছে যাবার জন্যে জেদ করবি না তো !

টগর আবার ভয়ে শ্যামার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে করুণ চোখে বলল, আচ্ছা।

কিন্তু রাত্রিতে দেখা গেল অন্য ব্যবস্থা। শ্যামা তার নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে পাশের একটা ছোট্ট ঘরে বিছানা করে নিয়েছে।

টগর বলল, একি দিদি তুমি পাশের ঘরে শোবে নাকি ?

শ্যামা বলল, না তোর সঙ্গে এক সঙ্গে শোবো।

টগর বলল, না দিদি, তুমি এ ঘরে শোও, আমি ছোট ঘরে শুই।

শ্যামা ধমক দিয়ে বলল, ছোট, বলছি না আমার মুখের ওপর কথা বলবি না।

সে রাত্রে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শ্যামা যখন ছোট ঘরে চলে এল, নিজের অধিকারের জন্যে একটুকুও তার দুঃখ হল না। বরং টগরের জন্যে মন মমতায় ভরে উঠল। আহা বেচারী, বড় দুঃখী মেয়ে, ওকে না দেখলে দেখবে কে ? মেয়েদের মন যে চিরকাল অন্য খাদে বয় তার খোঁজ অন্তত পুরুষরা রাখত না। যদি রাখত তাহলে কি এদের নিয়ে এমনি ছিনিমিনি খেলা হত ? অবশ্য না খেললে পুরুষদের

আনন্দ হবে কিসে? নবনীধর যদি জুড়ি গাড়ি করে বাগবাজার থেকে মেছুয়াবাজারে না যেত, আর মালা সুন্দরীর গান না শুনত তাহলে কি তার ঘুম হত?

নিবারণ যদি তার মনিবের জন্যে হুগলী জেলার গ্রাম তচনচ করে মেয়ে যোগাড় করে না আনত তাহলে কি মনিবের মন পেত? মনিবের মন পাবার জন্যে নিবারণের যত মাথাব্যাথা, মেয়েদের কথা কি একবারও ভেবেছে? সাধারণ মেয়েদের কথা ভাবার জন্যে যেন কেউই নেই।

রাখহরি মুখোপাধ্যায়ও তো মেয়েদের কথা ভাবত না। ব্যবসা করে টাকা উপায়েরই ফন্দী ছিল। বিয়ে করে টাকা উপায়ে মন উঠছিল না বলে অন্যদিকে মন দিল, নিবারণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করল। আমার টাকা চাই নিবারণ, তুমি যদি মেয়ে নিয়ে টাকা না দাও?

নিবারণ, বেইমান নয়, সে দিব্যি গেলে বলল, মাইরী বলছি ঠাকুরমশাই, আপনি টাকা ঠিকই পাবেন। এক গ্রামে থাকি, আমি কি টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাব?

রাখহরি বলল, পালাতেও তো পার। টাকাগুলো তো কম নয়। তোমায় আমি কলকাতায় কোথায় খুঁজব?

নিবারণ বলল, খুঁজতে হবে কেন? আমি তো কলকাতা থেকে প্রায়ই দেশে আসি।

রাখহরি বলল, যদি আর নাই আসো? রাখহরি টাকার ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করে না।

নিবারণও এই অবিশ্বাসে খুব আহত হল। বলল, বেশ, ঠাকুরমশাই আমি অ্যাডভান্স এনে দেব, তাহলে হবে তো। তাহলে খুশি তো!

রাখহরি এতেও খুশি হল না! বলল, কিন্তু অর্ধেক অ্যাডভান্স এনে দিতে হবে। বাকী কাজের পরে।

আচ্ছা তাই কথা থাকল।

গড়গড়া টানতে টানতে নবনীধর বলল, বলিস কিরে? পাঁচশ টাকা। কি আনবি তার কিছু ঠিক নেই, আগেই টাকা?

নিবারণ বলল, হুজুর জিনিসটি বড় ভাল। ভাল জিনিস নিতে গেলে যে ভাল দাম দিতে হবে।

তা নয় দেওয়া গেল কিন্তু সেবারের মত হবে না তো! সেই যে মন্দাকিনী না ফল্গুধারা কি যেন নাম, সেরকম হবে না তো!

নিবারণ লজ্জা পেয়ে গেল, বলল না হুজুর সেরকম হলে আর এত টাকা অ্যাডভান্স চাইব কেন?

নিবারণ চলে গেল। নিবারণের খুব গর্ব হল মনিব তার কথা কত শোনেন। এরকম মনিব সে জীবনে আর কখনও পাবে না।

ম্যানেজার টাকা দিতে দিতে কটমট করে তাকিয়ে বলল, এই তো সেদিন দুশো টাকা নিয়ে গেলি আবার টাকার কিসে দরকার পড়ল!

নিবারণ বলল, আপনি দেন তো! অত জমা খরচে আপনার দরকার কি? হুজুর হুকুম দিয়েছেন, আপনার দেওয়া নিয়ে কথা।

নিবারণের স্পর্ধায় ম্যানেজার রেগে গেল কিন্তু কথা বলতে পারল না। পরের চাকরি করতে গেলে যে অনেক কিছু দেখে চুপ করে থাকতে হয় শম্ভুচরণ দাস সেটা জানে। তাই টাকাটা গুনে দিতে দিতে কটমট করে শুধু তাকাল।

আর নিবারণ টাকাটা গুনে নিতে নিতে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। ঠাকুর মশাই যে খুব খুশি হবে, আর তার ক্ষমতার প্রশংসা করবে এই কথা ভেবে তার মন ছটফট করে উঠল।

নিবারণ বলল, ঠিক আছে ম্যানেজার মশাই, পঞ্চাশখানা নোটই আছে।

ম্যানেজার বলল, আমি তোকে কি কম দেব? কি তুই ভেবেছিস?

নিবারণ তাড়াতাড়ি জিভ বের করে বলল, সে কি কথা ম্যানেজার মশাই? তা কি হতে পারে? আপনি যে দেবতা। টাকার ভাণ্ডার নিয়ে রয়েছেন না! টাকার ভাণ্ডার নিয়ে আছেন বলেই তো আপনার এত নাম ডাক?

তিতুরামের মনে কত কথাই আজ আসছিল। জীবনের কাহিনীর যেন শেষ নেই। আঠার বছর থেকে এই পঞ্চাশ বছরের শেষ ধাপ পর্যন্ত যেন এক একটি কাহিনী এক একটি জলন্ত অধ্যায়। কষ্ট করে মনে করতে হয় না। একটু অন্য-মনস্ক হলেই পর পর ভেসে ওঠে।

জগদম্বা ঘরে ঢুকল, হাতে আলো। একি তুমি অন্ধকারে চুপ করে বসে কি করছ?

তিতুরাম বলল, কিছু না। তোমার কাজ শেষ হল?

জগদম্বা বলল, না কেন?

তিতুরাম বলল, না এমনি জিজ্ঞাসা করছি। তোমায় বুঝি সংসারের অনেক কাজ করতে হয়?

জগদম্বা সেই লম্বা লম্বা দাঁত বের করে হাসল। একদিন এই হাসি দেখে তিতুরামের গা ঘিন ঘিন করে উঠেছিল, আজ কিন্তু উঠল না। বরং ভাল লাগল। জগদম্বার এই সারাদিনের পরিচর্যায় তাকে ভাল লেগে যাচ্ছিল।

জগদম্বা বলল, আমাদের সংসারের কাজ কি কম? আমাদের কতগুলি ভাই বোন জানো? মায়েরা সবাই মিলে কাজ করে। তুমি একটু বসো। আমি তোমার জন্যে দুধ মুড়ি নিয়ে আসি।

জগদম্বা চলে গেল। তিতুরাম আবার সেই প্রদীপের আলোর সামনে বসে ভাবনার গভীরে ডুবে গেল।

একদিন সকালে কে যেন এসে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মশাই।

মেজমামা বেরিয়ে এল, কে ডাকে? কিন্তু ফিরে এসে বলল, দাদার যত আজে বাজে লোকের সঙ্গে কথা। ঐ নিবারণটার সঙ্গে দাদার কি দরকার অ্যাঁ?

মা বলল, তা কে জানে? তা নিবারণ এমনকি খারাপ লোক। শুনি তো কলকাতায় ভালো চাকরি করে।

মেজমামা বলল, হ্যাঁ চাকরি ভাল করে। বড়লোকের বাড়িতে চাকরি করে কিন্তু সেদিন কি হয়েছে জানো? নন্দীদের পুকুর পাড়ে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে হরসুন্দরীকে কি বলেছিল সেই নিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড। আসলে লোকটা কি করে জানো? বড়লোক বাবুকে মেয়ে সাপ্লাই করে।

মা শুনে বলল, ওমা কি সর্বনাশের কথা? তা দাদার সঙ্গে ওর কি দরকার? না না এসব লোকের সঙ্গে একদম মেশা উচিৎ নয়। এই সব সর্বনেশে লোক এই গ্রামে থাকে? ও তিতু কোথায় গেলি?

তিতুরাম সামনে এসে দাঁড়াল, কি বলছ মা?

তুই ওই নিবারণকে চিনিস?

নিবারণকে চেনে না এ গ্রামে এমন কেউ নেই। তিতুরাম বলল, চিনব না কেন?

মা বলল, ও নাকি তার মনিবের জন্যে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে টাকা আদায় করে।

তিতুরাম চুপ করে রইল। তিতুরাম যে এটা না জানে তা তো নয়।

মা বলল, আবার দাদাকে ডাকতে এসেছে। দাদার সঙ্গে ওর কি দরকার রে?

বলতে বলতে রাখহরি মামা এসে বাড়িতে ঢুকল। মা বলল, দাদা, নিবারণ নাকি মেয়ে নিয়ে গিয়ে ওর মনিবকে দেয়।

রাখহরি মামা মাকে ধমক দিল, তোকে কতদিন বলেছি না গিরি মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাকবি?

মার এই কথা শুনলে এত রাগ হয়ে যায় যে মার মুখে আর কথা যোগায় না। মা আর কিছু বলতে না পেরে মুখ শুকনো করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। তিতুরামের খুব কষ্ট হল। মায়ের এই দুঃখে ওর অন্তর কাঁদে।

রাখহরি মামা এবার ভেতর দিকে তাকিয়ে কোমরের পুঁটুলী থেকে এক গোছা নোট বের করল। অর্ধেক ভাগ করে তিতুরামের হাতে দিয়ে বলল, আড়াই শো

আছে, নে তোর বাক্সে তুলে রাখ। আর বাকীটা পাবি পেঁৗছে দিলে। কবে হেমাকে নিয়ে যাচ্ছিস ?

তিতুরাম দিনটা বললো। কিন্তু তিতুরাম হাত দিয়ে টাকাগুলো নিতে সঙ্কোচ বোধ করছিল।

মামা ধমক দিল, কি হল টাকাগুলো নিবি তো ? ব্যাটা নিবারণ ফাঁকি দেবার চেষ্টায় ছিল। হুঁ হুঁ বাবা আমিও রাখহরি মুখুজ্যে, বিয়ে ব্যবসা করে খাই।

তিতুরাম টাকাগুলো নিয়েও তখনও অন্যমনস্ক হয়েছিল। বার বার মনে পড়ছিল হেমাঙ্গিনীর মুখখানি। হেমাঙ্গিনী আজ তাকে ভালবাসে! সেই হেমাঙ্গিনীকে টাকার বিনিময়ে কারুর হাতে তুলে দিতে তিতুরামের বুক ফেটে যাচ্ছিল।

তিতুরাম বলল, মামা, এ টাকা তুমি ফিরিয়ে দাও। আমি এ কাজ করতে পারব না।

রাখহরি মামা ধমক দিল, কি ছেলেমানুষী লাগিয়েছিস্ তিতু ? টাকাগুলো বাক্সে তুলে রাখ! তোর কি একটা বউ ?

চারদিকে শুধু বিদ্যাসাগরের নাম, বিদ্যাসাগরের কথা আর বিদ্যাসাগরের আলোচনা। বিদ্যাসাগরমশাই যেন রাতারাতি স্বনামধন্য হয়ে গেছেন।

বিধবা বিবাহের আইন পাশ হয়ে গেছে।

চারিদিকে হৈ চৈ। যারা সমর্থন করল, তারা মিছিল বের করল। মিছিলের সামনে বিদ্যাসাগরের ফটো বিদ্যাসাগরের বাণী।

কিন্তু ওদিকে বিদ্যাসাগর মশাই বসে নেই। বিধবা বিবাহের আইন পাশ হয়ে গেছে। বহুবিবাহ বন্ধের জন্যে আইনের খসড়া হচ্ছে! কিন্তু বিধবা বিবাহের আইন যে পাশ হয়েছে একটা বিয়ে না দিলে তো নয় ?

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন, কে বিধবা বিবাহ করবে ?

রাজেন্দ্র মল্লিক বললেন, তাই বলে বসে থাকলে তো চলবে না। আইন পাশ হলেই তো হয় না! সেই আইন চালু করতে পারলেই আইনের আসল কাজ হবে।

বিদ্যাসাগর মশাই বললেন, আমি বিধবা বিবাহ করব।

এ ওর মুখের দিকে তাকাল। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সেওড়াফুলীর রাজা পূর্ণচন্দ্র রায়, তারপর প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ বহু জ্ঞানী গুণী উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাই যে কথা বলছেন এখুনি যদি সমর্থন করা যায়, তাহলে ঠিক তিনি বিয়ে করে বসবেন।

টাকীর প্রিয়নাথ চৌধুরী বললেন, বিদ্যাসাগর মশাই, আপনি তো বিবাহিত,

আপনি কি বিয়ে করে বহুবিবাহকে সমর্থন করবেন ? তাহলে বহু বিবাহের আইন পাশ হবে ?

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন, সে কথা তো জানি বলেই ভাবছি।

কিন্তু কাকেও দেখা গেল না বিধবা বিবাহ করে আইনকে বলবৎ করবে। অবশ্য সেখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যে এখনও বিয়ে করে নি।

বিদ্যাসাগর মশাই বললেন, ঠিক আছে ? আইন পাশের জন্যে যখন এত কষ্ট করেছি তখন বিয়ে একটা দেবই।

আইন পাশ হয়েছে বটে। যারা সমর্থক তারা খুব আনন্দ করছে কিন্তু কোথাও একটা বিয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের চোখে ঘুম নেই। মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তা, কি করে বিধবা বিবাহ দেওয়া যায় ! বিধবা মেয়ে নিয়ে অভিভাবকরা আসতে লাগল। বিদ্যাসাগর মশাই শুধু কি আইনই পাশ হয়ে থাকবে, মেয়েগুলির কি কোন হিল্লে হবে না ?

কচি কচি সরল মেয়েগুলির মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগর মশাই কাতর হয়ে উঠলেন। বললেন, তোমরা যাও, আমি দেখছি কি করা যায় ?

এদিকে গান বাঁধা হয়ে গেল।

'সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছো রিপোর্ট', বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হয়েছে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম
বিধবা রমণীদের বিয়ে লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় লয়ে।
আর কেন ভাবিসলো সই ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশরেরচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন না কো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক-লাজভয়ে।'
একাদশী উপসের জ্বালা, কানেতে লাগিত তালা,
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা জুড়াবে জীবন,
দুজনাতে পালঙ্কেতে, করিব শয়ন
বিনাইয়া বাঁধবো খোঁপা গুজিকাটি মাথায় দিয়ে।
সেদিন হতে মহাপ্রসাদ, শুনেচি ভাই এ সংবাদ,
সেদিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
পছন্দ করেছি বর, না হতে হুবুম
ঠাকুরপোরে করব বিয়ে, ঠাকুরঝিরে ব'লে ক'য়ে।।'

বাগবাজারে নবনীধরের মাথায় ওসব নেই। কোথায় কি আইন পাশ হল, সে কি জন্যে তার জানার দরকার নেই। হঠাৎ একদিন বাইরে খোল করতাল নিয়ে গান গাইতে গাইতে কাদের চলে যেতে দেখে জানলায় এসে গান শুনে তার পুলক জাগল। ডাকল, নিবারণ!

নিবারণ বলল, কি হুজুর?

এসব খোল করতাল বাজিয়ে ঐ লোকগুলি কেন যাচ্ছে?

আজ্ঞে বিধবাদের বিয়ে হবে, সেই জন্যে আইন পাশ হয়ে গেছে।

নবনীধর সব সময়ে মদ খেয়ে থাকে। মদ আর মেয়েমানুষ ছাড়া জগতের আর কিছু জানতে চায় না। আর মাঝে মাঝে ম্যানেজার টাকা দিতে দেরী করলে চটে যায়, তখন আর মেজাজ ঠিক থাকে না। সেই নবনীধরও এই তাজ্জব কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। বিধবাদেব হবে বিয়ে? তাহলে আমাদের বাড়ির মোক্ষদা ঝিব মেয়ে পারুলবালারও বিয়ে হবে?

নিবারণ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা তারও হবে।

বড় তাজ্জব কথা তো! তাহলে নিবারণ আমিও তো একটা বিয়ে করতে পারি?

নিবারণ বলল, আজ্ঞে পারেন হুজুর।

তাহলে নিবারণ ব্যবস্থা কর। ম্যানেজারকে বলো বিধবা বিবাহের জন্যে দু'হাজার টাকা দিতে।

নিবারণ বলল, হুজুর একটি নিবেদন আছে।

নবনীধর বলল, কি?

হুজুর আপনি বিয়ে করতে পারবেন না।

নবনীধর বলল, কেন?

হুজুর গিন্নিমা বেঁচে রয়েছেন। গিন্নিমা মলে না হয় চেষ্টা করে দেখা যেত।

নবনীধর বলল, কেন এক বউ থাকতে বিধবা বিবাহ করতে পারব না? আইনে কি সেই কথা বলেছে?

নিবারণ মুখ্যু হলেও খোঁজ খবর ঠিকই রাখে। নিবারণ তো শুধু ভৃত্য নয়, মনিবের একরকম ডান হাত। বাবু অনেক কথা ভুলে গেলে নিবারণ মনে করিয়ে দেয়। সেই নিবারণ বলল, না হুজুর, বিদ্যেসাগর মশাই সে পথটি মেরে রেখেছেন। তিনি তো দুটো আন্দোলনই জোরদার চালাচ্ছেন। একটার আইন পাশ হল বলে।

নবনীধর বলল, সেটা কি?

নিবারণ বলল, আজ্ঞে বহু বিবাহ।

নবনীধর সন্তুষ্ট হতে পারল না। রেগে বলল, এই পণ্ডিতটাকে কেউ মেরে লোপাট করে দিতে পারে না!

আঁজ্ঞে তারও চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু খুব নাকি তিনি একগুঁয়ে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনিভাবে নবনীধর বলল, নিবারণ সেই যে পাঁচশ টাকা নিয়ে গেলি তার কি হল ?

আঁজ্ঞে দিন তো ঠিকই আছে। নির্দিষ্ট দিনেই হুজুরের সামনে এনে হাজির করব।

দেখো বাবা ডুবিও না যেন।

নিবারণ বলল, বাবু ডুবিয়েছি কখনও !

তা কথাটা সত্যি। নিবারণ যেদিন যেটি বলেছে সেটি করেছে। মদ পাওয়া যায় না। সাহেবদের দোকান থেকে খুঁজে পেতে মনিবদের জন্যে মদ এনে দিয়েছে ! হঠাৎ জুড়েগাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। নিবারণ, বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখ তো ? নিবারণ তাকিয়ে দেখল, একটি সুন্দরী বউ বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে। নিবারণ বলল, হুজুর দেখেছি।

নবনীধর আর কিছু বললেন না কিন্তু নিবারণ বুঝে নিল ব্যাপারটা কি ?

তারপর দেখা গেল, নিবারণ ম্যানেজারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। আর একদিন সেই সুন্দরী বৌ বারান্দা থেকে নেমে এল নবনীধরের বৈঠকখানায়।

এতে নিবারণের তো কোন স্বার্থ নেই। নিবারণ শুধু চাকরি বাঁচাবার জন্যে এসব করে। চাকরি না বাঁচলে মনিব খুশি না হলে তার ভাগ্যটা যে রসাতলে যাবে। নিবারণ এমন ধরনের লোক যে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বসে থাকে না। আর মনিব মদ মেয়েমানুষ পছন্দ করে, সে যোগাড় করে দিলে তো কিছু অতিরিক্ত পেয়েই যায়। এটাই তো তার উপরি লাভ। এটাই তো তার ভাগ্য।

তারপর কলকাতার সমাজ জীবনে বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য দিন এল। বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহ দেবেন। না, তিনি নিজে বিয়ে করছেন না। পাত্র পেয়েছেন। পাত্রীও প্রস্তুত। পাত্র, যশোরের প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের ছোট ছেলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী নদীয়া পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা মেয়ে কালীমতি। বিয়ে হবে সুকিয়া স্ট্রীটের রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

শহরের লোক আবার নেচে উঠল। আইন পাশ হয়েছে হয়েছে, তা বলে বিয়ে ? সত্যিকারের বিয়ে হবে এ যে কেউ ভাবতেই পারে নি। সুকিয়া স্ট্রীটের দিকে সারাদিন ধরে লোক ছুটতে লাগল। এ তো সাধারণ বিয়ে নয়। এ যে ভাবা যায় না। এই তাজ্জব বিয়ে দেখার জন্যে লোক আসার বিরাম নেই। গ্রাম থেকে গ্রাম উজাড় করে মেয়ে পুরুষ, পাল্কী, গরুর গাড়ি করে আসতে লাগল। হেঁটেও কেউ কেউ এসে পড়ল। সুকিয়া স্ট্রীটের ঐ স্বল্প পরিসর জায়গা যেন

মানুষের ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল। বিয়ে হবে রাত্রিবেলা কিন্তু লোক সমাগম ভোর থেকেই হতে লাগল।

লোকের কৌতুহল, একজনকে দেখার ইচ্ছে। বিদ্যাসাগরের মত দেখতে কেউ ঢুকেছে, থান ধুতি, গায়ে উড়ুনি, মাথায় টিকি, পণ্ডিতগোছের ব্যক্তি, তাকে দেখেই লোকে চিৎকার করে উঠছে, ঐ যে বিদ্যাসাগর! অমনি ছুটে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরছে।

মেয়েরা চোখের জলে পা ভিজিয়ে দিচ্ছে, বিদ্যেসাগর, তুমি না থাকলে আমাদের কেউ দেখত না। তুমিই আমাদেব দুঃখ বুঝেছ।

যার পা জড়িয়ে ধরা হয়েছে তার অপ্রস্তুত অবস্থা। না, না আমি বিদ্যাসাগর নই।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? ততক্ষণে পণ্ডিতের পা দুটি নারীর চোখের জলে ভেসে গেছে।

কে যেন পাশ থেকে বলল, লক্ষ্মী পা ছাড়িস না, জড়িয়ে ধরে থাক। তিন বছরে বিধবা হয়েছিস্ এখন তোর বাবো। যদি একটা বিয়ে হয় বেঁচে যাবি।

এইভাবে চলতে লাগল সুকিয়া স্ট্রীটের ঐ গলি প্রাঙ্গণে নানা গোলমাল। এইভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সারা কলকাতা শহব। রাস্তায় বাস্তায় সংকীর্তন। বিদ্যাসাগরের নামে গান। মেয়েবা সেই সংকীর্তনের দলে লাজ লজ্জা ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ল। কেঁদে কেঁদে গান গাইতে লাগল 'আমার বিয়ে হবেগো আমি বিধবা হইলেও'···এত কলরব জেগে উঠল যে শান্ত কলকাতা একদিনের উত্তেজনায় উন্মাদ হয়ে উঠল। যাবা এর বিরুদ্ধবাদী তারা সহ্য করতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, বন্ধ কর, এ সব হট্টগোল।

যারা ধনী শ্রেণীর তারা বলল, দাবওয়ান, গেট বন্ধ কবে দাও। একটা পাগল লোকের জ্বালায় সারা শহর মেতে উঠেছে। বিধবার আবাব হবে বিয়ে? এঁটো পাতে বসে আবার খাওয়া? ঐ পাগল পণ্ডিতটাকে কেউ মেবে শেষ করে দিতে পারে না? কলকাতাব শহবে কি একটাও গুণ্ডা নেই?

রাধাকান্ত দেব সবচেয়ে বিরুদ্ধবাদী। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন। লোক ভাঙাবার জন্যে সুকিয়া স্ট্রীটের ভীড়ের মধ্যে এই বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে নানান কুৎসা রটাবার জন্যে লোক পাঠালেন কিন্তু কিছুই হল না।

জনগণ তখন অন্য এক ভাবে বিভোর। সমাজের এই যে অবহেলিত নারীদের একটা হিল্লে হচ্ছে, যারা এই নারীদের দুঃখে কাতর, তারা আর কোন বাধা মানতে চায় না।

কিন্তু তবুও গণ্ডগোল হতে লাগল। এক জায়গায় বহু লোক। গণ্ডগোল না

হয়ে যায় ? তর্ক, কথা কাটাকাটি শেষে মারামারি। পুলিস এসে গেল। পুলিস এসে জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

কিন্তু বিদ্যাসাগর হুকুম দিয়েছেন, কাউকে যেন মারধর না করা হয়। গণ্ডগোল তো হবেই। বহুদিনের সামাজিক কুপ্রথা বদলানোর চেষ্টা হচ্ছে, তাতে একটা ওলোট পালট হবে না!

বিদ্যাসাগরকে পুলিস বিভাগ মান্য করে। বিদ্যাসাগরের কথাই পুলিস মেনে নিয়েছে। শুধু জনতাকে শান্ত করবার জন্যে তারা মাথা ঘামিয়ে কাজ করছে।

এই সময়ে নবনীধর তার বৈঠকখানায় গড়গড়া টানতে টানতে ঝিমুচ্ছিল। হয়ত তার মনে মালাসুন্দরীর সুঠাম দেহবল্লরীর কথাই মনে পড়ছিল। এই সময়ে সেই তন্ময়তা তার ছুটে গেল, বাইরে যেন কিসের একটা গণ্ডগোল হচ্ছে ?

নিবারণ!

হুজুর!

বাইরে কিসের গণ্ডগোল দেখ ত।

নিবারণ সব জানে। নিবারণ সেখানে যাবার জন্যে তো প্রস্তুত হচ্ছিল। নিবারণ বলল, হুজুর আপনি জানেন না ? আজ যে বিধবার বিয়ে ?

নবনীধরের ওসব জানার দরকার নেই। নবনীধর অন্য চরিত্রের লোক। নবনীধর মদ মেয়েমানুষ পেলেই চুপ করে থাকে। নবনীধর বলল, তার জন্যে এত গোলমাল কেন ?

নিবারণ বলল, বিধবাদের তো কোনদিন বিয়ে হয় নি। সেই বিধবার বিয়ে হচ্ছে।

নবনীধর বলল, নিবারণ, মদ দে!

আজ্ঞে হুজুর, এই সকালবেলা মদ খাবেন ? ডাক্তার বলেছে না একটু মদ কমাতে। লিভারের অবস্থা ভাল নয়।

নবনীধর চটে গেল, বলল, তোকে যা বলেছি তুই কর তো! আমার লিভার গোল্লায় যাক।

নবনীধর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বলল, তার কি করলি ? পাঁচশ টাকা কি হজম করে দিলি ?

নিবারণ জিব কাটল, না হুজুর। আজই তো সেই দিন। আমি তো সেই জন্যেই যাচ্ছি।

নবনীধর বিরক্ত হল। বলল, তুই বড় মিথ্যে কথা বলিস নিবারণ তুই তো যাচ্ছিস ঐ বিয়েটা দেখতে।

নিবারণ বলল, আজ্ঞে না হুজুর। আমি সেই মেয়েটাকে আনতে যাচ্ছি।

মেয়েটাকে আনতে যাচ্ছিস মানে ?

নিবারণ তার মনিবকে ব্যাপারটা সব খোলসা করে বুঝিয়ে দিল।

নবনীধর গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, আচ্ছা যা। কিন্তু যদি মিথ্যে কথা হয়, তাহলে কিন্তু তোর মাথা ভেঙে দেব।

আজ্ঞে আমি কি কখনও আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি?

নিবারণ মিথ্যে কথা বলেনি বললো বটে কিন্তু সত্যি কথা কতগুলি বলে সেটাও কি বললো। লম্পট মনিবকে তার ম্যানেজ করতে হয়। এই লম্পট মনিবকে ম্যানেজ করতে গেলে যে সত্যি কথা বলা যায় না সেটাও সে জানে।

নিবারণ জামাকাপড় পড়ে সুকিয়া স্ট্রীটে চলে গেল। ঠাকুরমশাই এই পথ দিয়ে বাগবাজারে আসবে। নিবারণ এই ভেবে একবার সুকিয়া স্ট্রীটের ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল! পুলিস ওর পথ রুখে দাঁড়াল। এই হট্ যাও!

নিবারণ বলল, সিপাইজী, আমার বাবা এই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে।

সিপাই বলল, কে তোমার বাবা?

এই সময়ে আর একটা ভীড় এসে নিবারণের ঘাড়ে পড়ল। নিবারণ কোথায় ছিটকে চলে গেল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেই ভীড়ের মধ্যে তিতুরাম ও হেমাঙ্গিনী। তিতুরাম বলল, হেমা, এদিকে চলে এস। এদিকে থেকে দরকার নেই। ভীষণ ভীড়।

হেমা বলল, বারে, বিধবা বিবাহ দেখব না?

হেমা পরেছে সুন্দর একটি ডুরে শাড়ি। ওকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে ওকে একদম গাঁয়ের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে না। বরং অনেকেই ফিরে ফিরে দেখছিল। হেমা দেখছিল বিয়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে। আর হেমাকে দেখছিল সবাই। তিতুরামের দেখে রাগ হচ্ছিল। ভীষণ হিংসেও হচ্ছিল। একজন হেমার গায়ে ইচ্ছে করে পড়তে তিতুরাম তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল।

লোকটি বলল, কি ব্যাপার, ধাক্কা দিলে কেন?

তিতুরাম বলল, ওর ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছিলে কেন? তিতুরাম তারপর ইচ্ছে করেই হেমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল।

হেমা খুশি হল না। বলল, বারে, তুমি টেনে আনলে কেন? মেয়েটিকে দেখতুম। বিধবা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

তিতুরাম বলল, না দেখতে হবে না। লোকেরা সব তোমার ঘাড়ে পড়ছিল।

হেমা হেসে ফেলল, ঘাড়ে পড়েছে তো কি হয়েছে? আমাকে কি খেয়ে ফেলবে?

তা হোক, আমার ভাল লাগছে না চলো।

ঐ বিয়েটা দেখতুম। তুমি কোথায় যাবে? আমরা তো বেড়াতেই কলকাতায় এসেছি।

তিতুরাম চুপ করে রইল। ও যে বেড়াতে কলকাতায় আসে নি সে কথা কি করে বলবে? মামা কোথায় গেল?

মামা তো এই কিছুক্ষণ হল পিছনে পিছনে আসছিল।

হেমা বলল, চল, কোথায় যাবে? আচ্ছা, আমায় যে গড়ের মাঠ দেখাবে বলেছিলে তার কি হল?

তিতুরাম বলল, আজ থাক, অন্য আর একদিন দেখাব।

হেমা বলল, কেন আজ কি হয়েছে? আমরা তো সন্ধ্যের সময়ে ফিরব।

তিতুরাম বলল, সে রাস্তাটা তো এদিকে নয় অন্যদিকে।

হেমা বলল, তবে তুমি এদিকে এলে কেন? এদিকে বুঝি গঙ্গা আছে? তবে চলো গঙ্গা দেখে আসি। স্নান তো করতে পারব না। কাপড় আনি নি, জলটা ছুঁয়ে যাই।

তিতুরাম বলল, গঙ্গাও এদিকে নয়।

তবে এদিকে কি আছে? শুধু তো রাস্তা। তুমি বুঝি শুধু রাস্তা দেখতে এসেছ?

তিতুরাম কোন কিছুরই জবাব দিতে পারল না। জবাব তার মুখে এল না। গঙ্গাও কোথায় তার জানা নেই। সেও তো এই শহরে নতুন। এ শহরে সে কখনও এসেছে নাকি? মামা যেমন যেমন বলে দিয়েছে সেও তেমন করেছে। মামাকে দেখেছে পিছনে আসতে। আর একবার দেখল ঐ ওপাশে। কিন্তু তিতুরামের ভাবনার মধ্যে এসব নেই, তিতুরাম ভাবছে আসন্ন সময় উপস্থিত। হাজার টাকার বিনিময়ে হেমাকে অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে।

হেমা বিরক্ত হল, বলল তুমি কি ভাবছ?

হঠাৎ কনে এসেছে কনে এসেছে বলে চীৎকার। একটা পাল্কী ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থামল।

হেমা ছুটে চলে গেল সেই ভীড়ের মধ্যে। তিতুরাম চিৎকার করে উঠল, হেমা হারিয়ে যাবে, যেও না!

হেমা ভ্রূক্ষেপও করল না। ভীড়ের মধ্যে সেই পাল্কী দেখতে চলে গেল।

তিতুরাম এগোচ্ছিল হঠাৎ রাখহরি মামা এসে তিতুর হাত চেপে ধরল। গম্ভীর চাপা স্বরে বলল, সরে পড়।

তিতুরাম বলল, কোথায়?

রাখহরি মামা বলল, কোথায় জানিস না তোকে কি শিখিয়ে দিয়েছি?

তিতুরাম সবই জানে কিন্তু সরে পড়তে তার ইচ্ছে করল না। হেমাকে ওদের হাতে তুলে দিতে তার ইচ্ছে করল না।

রাখহরি মামা বলল, কি হল সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? নিবারণ দাঁড়িয়ে আছে, হেমা বেরোলেই ওকে নিয়ে চলে যাবে।

নিবারণ এগিয়ে এল, বলল, কিছু ভাবতে হবে না। আমি ঠিক নিয়ে যেতে পারব।

রাখহরি মামা বলল, তাহলে টাকাটা ?

নিবারণ বলল, আমাকে কি বিশ্বাস হচ্ছে না ঠাকুর মশাই ? আমি যখন পাঁচশ টাকা পাইয়ে দিয়েছি, আর পাঁচশও পাইয়ে দেব।

রাখহরি মামা বলল, দেখো, যেন হাতছাড়া না হয়। টাকার জন্যেই তো এত। সেই টাকা যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এত মেহনত কেন ?

নিবারণ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেমাকে দেখেছে, হেমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছে। তার মনিব খুব পছন্দ করবে। এমনিই তার মনিব চায়। নিবারণ বলল, কিছু ভাবতে হবে না ঠাকুরমশাই, তুমি চলে যাও, আমি মেয়েটিকে নিয়ে যেতে পারব।

রাখহরি মামা বলল, তাহলে ঠিক আছে। তিতু চ।

তিতু বলল, না তুমি যাও। আমি হেমাকে নিয়ে যাব।

রাখহরি মামা এমন কথা শুনবে ভাবতে পারেনি। রেগে বলল, কি বলছিস যা তা ? হেমাকে দিয়ে দেওয়া হবে এমনিই তো কথা ছিল ?

তিতুরাম ঘাড় নাড়ল।

রাখহরি মামা বলল, তবে ?

তিতুরাম বলল, হেমাকে আমি দেব না। রাখহরি মামা বলল, তাহলে টাকাটা ফিরিয়ে দে।

তিতুরাম বলল, এখানে নেই বাড়িতে আছে। বাড়িতে গিয়ে দেব।

রাখহরি মামা বলল, তা হবে না, এখুনি দিতে হবে।

এই নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি লেগে গেল। তিতুরাম টাকা দিতে পারছে না। আর রাখহরি মামারও এখনই টাকা চাই।

নিবারণ বলল, আমি তো টাকা ফেরত চাইনি। আমি জিনিস চাই।

রাখহরি মামা বলল, নিবারণ তুমি কিছু মনে কর না, আমি এককথার মানুষ। ভাগনেকে দলে টানাই ভুল হয়েছে। ভাবলুম ওরও কিছু হবে, আমারও কিছু হবে।

নিবারণ বলল, তাহলে আমি দাঁড়াব না চলে যাব। হুজুরকে যে কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

এই সময় ভীড় ঠেলে মেজমামার পেছন পেছন হেমা বেরিয়ে এল। সেই দেখে রাখহরি মামা একদিকে, আর নিবারণ অন্যদিকে সরে পড়ল।

মেজমামা বলল, দাদা না এখানে ছিল ?

তিতুরাম জবাব দিল না।

নে তোর বউকে। কলকাতায় কি করতে এসেছিস ? বিয়ে দেখাতে ?

তিতুরাম বলল, হ্যাঁ।

মেজমামা খুশি হয়ে বলল, আগে আমাকে বললি না কেন ? আমার সঙ্গে আসতিস ? বৌমা কনে ভালো না ?

হেমা ঘাড় নেড়ে বলল খুউব।

তিতুরাম বলল, মেজমামা আমরা যাই।

মেজমামা আশ্চর্য হয়ে বলল, চলে যাবি, বিয়ে দেখবি না ? এযে দারুণ বিয়ে।

তিতু তো বিয়ে দেখতে আসে নি। তিতুরাম যা করতে এসেছিল, মেজমামা যদি এক্ষুণি শোনে তাহলে মারতে শুরু করবে।

মেজমামা বলল, চ, বিয়েটা দেখেই যাবি। এমন বিয়ে তো জীবনে দেখিস নি। আমার নিমন্ত্রণ আছে তোরা আমার সঙ্গে থাকলে অসুবিধা হবে না।

তা অসুবিধা সত্যিই হল না। এমন বিয়েতো জীবনে ঘটে নি। নিচে কাতারে কাতারে লোক। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির মধ্যেও লোকে লোকারণ্য। হেমাকে নিয়ে গিয়ে মেজমামা মেয়েদের মধ্যে ছেড়ে দিল। সেখানে কনেকে সাজানো হচ্ছিল। হেমা কালীমতীকে দেখল। দেখে অবাক হয়ে গেল। কালীমতী তার বয়সী মেয়ে। কালীমতী হাসছে। অনেক ভাল ভাল কাপড় পরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা এসেছেন।

কে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, কালীমতী, তোমার বিয়ে করতে ভাল লাগছে ?

কালীমতী মাথা কাত করে বলল, খুউব।

তোমার আগের স্বামীর কথা মনে পড়ছে না ?

কালীমতী বলল, আমি তো তাকে দেখিনি। আমার যখন ছ'বছর বয়স তিনি মারা গেছেন।

তিনি ! খটকা লাগল কারো কারো মনে। তারা জিজ্ঞাসা করল, যাকে কখনও দেখনি তাকে তিনি বলছ কেন ?

বাহ তাকে সম্মান করব না ?

তাকে তো কখনও দেখ নি।

নাই বা দেখলাম। তিনি তো আমার স্বামীই ছিলেন।

এই ছিল তখনকার দিনের মেয়েরা।

ওরা যতই অবহেলিতা বা অসম্মানিতা হোক স্বামী জ্ঞানে যাকে তারা জেনেছে তাকে তারা সম্মান করবেই।

কে একজন বলল, আজ যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তাকে সম্মান করবে না ?

কালীমতী মাথা নাড়ল।

কেন করবে ?

কালীমতী লজ্জিত হয়ে বলল, তিনি যে আমার স্বামী হবেন।

আর যে স্বামী মারা গেছে ! তাকে মনে পড়বে না ?

বাহ তাকে তো আমি কখনও দেখিই নি।

মনেও পড়বে না ?

একটু একটু পড়বে বৈকি।

তাহলে তুমি কি করবে ? দুটো স্বামীর কথা ভাববে ?

কালীমতী চুপ করে রইল। কালীমতী এর উত্তর জানে না। কেউ জানে না এর উত্তর।

এসব কথা আলোচনা হচ্ছিল কালীমতীর মা লক্ষ্মীমণি তখন ছিলেন না বলে লক্ষ্মীমণি যখন এসে পৌঁছল সবাই চুপ করে গেল।

বর এল সন্ধ্যার একটু আগে। বরের সঙ্গে সকলেই এসে পৌঁছল। মেজমামা একপাশে দাঁড়িয়ে তিতুরামকে ফিস ফিস করে সবার নাম বলে যেতে লাগল। তিতুরাম দেখল, মেজমামা কত লোককে চেনে। টোলের পণ্ডিত, জয় নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি। তাছাড়া পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ। মেজমামা বলল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো এলেন না ? তিনি কি এই বিয়ে সমর্থন করেন না ?

এই সময়ে পরণে সাদা থান, গায়ে উড়নি, কপাল চওড়া মাথার পিছনে বিরাট এক টিকি নিয়ে যিনি এগিয়ে এলেন, মেজমামা তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

তিনি বললেন, তুমি এসেছ আমি খুব খুশি হয়েছি। তোমরা সকলে মিলে আমার আরব্ধ কাজ শেষ কর।

মেজমামা বলল, বিদ্যাসাগরমশাই আপনি কিছু ভাববেন না। শুভকাজ হবেই। কেউ আর আটকাতে পারবে না।

বিদ্যাসাগর মশাই একটু ম্লান হাসলেন, বললেন, কিন্তু অনেক বাধা। যতক্ষণ না কন্যা সম্প্রদান হয়, ততক্ষণ মনে শান্তি নেই।

এই সময়ে নিচে থেকে একটা হল্লা উঠল, বিদ্যাসাগর মশাই দ্রুত সেই দিকে চলে গেলেন।

তিতুরামের বুক গর্বে ফুলে উঠছিল। সে স্বচক্ষে বিদ্যাসাগর মশাইকে দেখল। তার জীবন ধন্য হয়ে গেল। তার তখন মনে রাখহরি মামার জন্যে একটুও দুশ্চিন্তা নেই। বরং ভাল লাগছিল, হেমাকে দেয় নি বলে।

হেমা বলল, জানো, আমার খুব ভাল লাগছে ?

তিতুরাম বলল, কিন্তু আমাদের বাড়ি যেতে হবে না ?

হেমা বলল, বাহ মেজমামা তো বললো এক সঙ্গে যাব। তাছাড়া বিয়েটা দেখে যাব না ?

তিতুরামেরও বিয়ে দেখার ইচ্ছে কিন্তু ওর ভয় হচ্ছিল, যদি অন্ধকার পথে রাখহরিমামা ও নিবারণ দাঁড়িয়ে থাকে ? আর ওর তো জানা আছে, কলকাতায় অনেক গুণ্ডা বাস করে। নিবারণ যদি গুণ্ডা নিয়ে এসে হেমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় ? মেজমামাও কিছু করতে পারবে না।

মেজমামা হয়ত বলবে, তিতু হেমাকে গুণ্ডারা নিয়ে গেল ? গুণ্ডারা খুব অসামাজিক। একটুও ভদ্রতা জ্ঞান নেই ব্যস্ এই বলে মেজমামা ট্রেনে গিয়ে উঠবে।

আর তিতুরামের অবস্থা কি হবে ? তিতুরাম তাড়াতাড়ি বলল, হেমা চলো চলে যাই, বিয়ে দেখে দরকার নেই।

হেমা বলল, না আমি বিয়ে দেখব।

তিতুরাম বলল, জানো পথে ঘাটে এখানে অনেক গুণ্ডা আছে। তোমায় যদি ধরে নিয়ে যায় ?

হেমা বলল, তুমি কিসের পুরুষ ? আমায় রক্ষা করতে পারবে না ?

ধর যদি তাদের সঙ্গে লাঠি সড়কি থাকে ?

হেমা বলল, ইস্ লাঠি সড়কি থাকলেই হল। তুমি কি ভেবেছ, আমি এমনি এমনি ধরা দেব ?

কিন্তু অত ঝামেলায় দরকার কি বাবা ? তোমায় নিয়ে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

হেমা হেসে ফেলল, বলল, তাই বলো। কিন্তু আমায় কেউ তোমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না গো, পারবে না দেখে নিও। হেমা আর দাঁড়াল না, ভেতর থেকে উলুধ্বনি শুনে একবার স্বামীর দিকে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর দৃষ্টি হেনে ছুটে চলে গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে তিনজনে যখন বাড়ির পথ ধরল, তখন অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। তা ওরা খাওয়া দাওয়ার আয়োজন মন্দ করল না। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের আনন্দ দেখে কে ? তিনি যেন নৃত্য করতে লাগলেন।

পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র বললেন, বিদ্যাসাগর মশাই আপনার সাধনা সফল হয়েছে তো !

বিদ্যাসাগর মশাই বললেন, সে আর বলতে ? যতক্ষণ না হচ্ছিল, আমার যেন বুকের ভেতরটা টিপ টিপ করছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্র বললেন, বিয়ের চেলিটা পাওয়া যাচ্ছিল না কেন জানেন

বিদ্যাসাগর মশাই ? ওটি চুরি করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদেরও লোক আছে চারদিকে। যে নিয়ে সরে পড়েছিল তাকে গেটে ধরেছিল সুশীল।

বিদ্যাসাগর মশাই বললেন, এসব তো আমি কিছু জানি না। সুশীলকে ডাকো, বকশিষ দিয়ে দিই।

প্যারিচাঁদ বললেন, আপনাকে বলা হয় নি। আপনার মানসিক অবস্থা যা তাতে এই কথা শুনলে আপনি হার্টফেল করতেন।

এই সব কথাই আলোচনা করতে করতে তিনজনে চলছিল। মেজমামাই বক্তা। কিন্তু তিতুরামের চোখ পথের দিকে। অন্ধকার একটু বেশি দেখলেই ওর শরীরের ভেতরটা কেমন শিউরে শিউরে উঠছিল। আর অমনি ছুটে এসে হেমার হাত চেপে ধরছিল।

মেজমামা সামনে এগিয়ে চলেছে। মেজমামাকে সত্যিই পণ্ডিতের মত দেখতে লাগছে। মেজমামা কোন কিছুই ভ্রূক্ষেপ করছে না। মাঝে মাঝে কথা বলছে আবার চুপ করে যাচ্ছে।

তিতুরাম হেমার হাত ধরলেই হেমা চাপাস্বরে বলছে, অ্যাই কি হচ্ছে ?

কিছু না।

তবে হাত ধরছ কেন ? মেজমামা রয়েছে না !

মেজমামা পেছন দিকে দেখছে না।

তুমি অসভ্য। বাড়ি যাওয়া পর্যন্ত বুঝি তর সইছে না।

না।

ঐ বিয়ে দেখে বুঝি মন খারাপ হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ।

হঠাৎ মেজমামা পেছন দিকে ফিরল। বুঝলি না তিতু। হেমা তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নিল। ওর মুখ লজ্জায় নত হয়ে গেল। মেজমামা শুধু হাসল, তারপর বলল, বুঝলি না তিতু, এই বিধবা বিয়ে হতে একটা ভাল হয়েছে, বিধবা মেয়েগুলির হিল্লে হয়ে গেল। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত না বলে যে সব পণ্ডিতরা হুজুগ তুলেছিল, তারা খুব জব্দ হল। আর আছে বহু-বিবাহ। সেটাও বন্ধ হয়ে গেলে মেয়েদের অনেক উপকার হবে।

হেমা সাগ্রহে বলল, সেটা বন্ধ হবে মেজমামা ?

মেজমামা বলল, বিদ্যাসাগর মশাইকে তো দেখলে। উনিই সে চেষ্টা করছেন।

হেমা বলল, তাহলে খুব মজা হবে। তিতুরামের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, তাহলে মেজমামা ঐ যে সব লোকগুলো অনেক অনেক বিয়ে করে তারা আর করতে পারবে না ?

তাইতো কথা আছে। আইন হলে কেউ আর এ কাজটি করতে পারবে না।

হেমা বলল, তাহলে খুব মজা হবে না মেজমামা ! কিন্তু মেয়েগুলোর কি হবে ?

মেজমামা বলল, মেয়েদের যেমন বিয়ে হয় তেমনি হবে ?

কিন্তু যাদের পয়সা নেই ?

মেজমামা বলল, তাদের হবে না।

কিন্তু এ কথাটা ঠিক হেমা ভাল মনে নিতে পারল না। যাদের পয়সা নেই তাদের বিয়ে হবে না। তবে তাদের কি হবে ? মেয়েরা বড় হলে তারা কি করে সে দেখেছে। এরকম জঘন্য জীবনও তার কাম্য নয়। বহুবিবাহ বন্ধের আইন হোক কিন্তু মেয়েদের বিয়েরও একটা ব্যবস্থা হোক।

হেমা যেন সব মেয়ের প্রতিনিধি। এই ভাবে কথাগুলো ভাবতে লাগল।

ওমা এখনও তুমি চুপ করে বসে আছ ?

জগদম্বা ঘরে ঢুকল, হাতে দুধ মুড়ির বড় বাটি। জগদম্বা যেন রাজরাণী হয়ে গেছে, এমনি গর্বিত ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে এগিয়ে এল।

তিতুরাম বলল, কি করব, তুমি কাছে আছ, আমার তো আর কিছু করার নেই।

জগদম্বার বয়স হয়েছে। এ বয়েসে ছোট মেয়ের মত আহ্লাদীপণা করা উচিত নয় কিন্তু বয়েস কি এ ক্ষেত্রে কেউ মানে ? যখন স্বামী বহুদিন পরে শ্বশুর বাড়ি এসেচে। জগদম্বা আহ্লাদী হয়ে উঠল। মুখ চোখ রাঙা করে বলল, আমি কি থাকলে তোমার ভাল লাগবে ?

কার না লাগে ?

জগদম্বা খুশি হয়ে উঠল। বলল, দাঁড়াও আমি আসছি। বলে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

তিতুরাম ঠিক করেছে আর কারও মনে দুঃখ দেবে না। এই যে জগদম্বা জানত, তার স্বামী মারা গেছে। ও তো থান পরে সিঁদুর তুলে নিরামিষ খাচ্ছিল। ওর তো দুঃখ কেউ ভুলেও দেখেনি। বাপ জগন্নাথ দুঃখটা বুঝত কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বিয়ে করা তো ঐ জন্যে আটকায় নি। বরং ঘরের মধ্যে মেয়েছেলের হাট বসিয়ে দিয়েছে। আর জগন্নাথের কথায়, জামাই, আমার যখন যাকে ইচ্ছে হয় তাকে নিয়ে শুই, ব্যবস্থাটা ভাল নয় ? নিত্য নতুন না হলে কি পুরুষের ভাল লাগে ?

জগন্নাথ বলে, তার বয়স তিতুরামের মতই। কই তিতুরামের তো এই বয়েসে এসব ভাল লাগে না ? বরং তার খারাপ লাগে। মনে হয়, এসব আর না

হলেই ভাল। অবসর গ্রহণ করলে হয়? কিন্তু ব্যবসা! ব্যবসা না করলে তিতুরাম খাবে কি? আর তো কোন কাজ তিতুরাম শেখে নি। ঐ ব্যবসা করতেই তো ভগবান তাকে পাঠিয়েছে। এই ব্যবসা করেই তাকে একদিন দেহ-ত্যাগ করতে হবে।

মামা যে কি ব্যবসা তাকে শিখিয়ে গেল? মামা যখন মরল, তিতুরামের সে কথা আজও মনে পড়ে কিন্তু সে কথা ভাবার আগে আরও অনেক কথা ভাবার আছে। মামা যে তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে গেল সে কথা না বললে মামার মৃত্যুটা বলা যাবে না।

হঠাৎ তিতুরামের কানে ঢুকল, ভেতর বাড়িতে কে যেন ছড়া কাটছে।

'বহুদিন পরে আমাদের জামাই এসেছে ওরে মেয়ে ছেলেপুলে চেয়ে নে।

লাজ লজ্জা নিয়ে এখন থাকিস্ নে।

জামাই মরলে বিধবা হলে থাকতে পারবি নে।'

হাসতে হাসতে জগদম্বা ঘরে ঢুকল। তিতুরাম জিজ্ঞাসা করল, কে ছড়া কাটছে?

জগদম্বা বলল, আমার ছোটমা। ছোটমা নিজে মুখে মুখে ছড়া বেঁধে সকলকে শোনায় তো!

তোমার ছোটমা তো খুব গুণের।

হ্যাঁ, ছোটমা আসতে বাবা খুব খুশি হয়েছে।

তোমার বাবা কি এই প্রথম খুশি হল?

এই কথায় জগদম্বা একটু লজ্জিত হল। রাঙা মুখ নামিয়ে নিল।

তিতুরাম সেটা দেখে মনে মনে হাসল। কুৎসিত মেয়েও এই সব কথায় কেমন হয়ে যায়। ওর ভালই লাগল, জগদম্বার এই লজ্জা দেখে।

জগদম্বা হঠাৎ বলল, একি তুমি এখনও খাও নি? দুধ যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তিতুরাম বলল, খাচ্ছি। তোমার ছোটমা কি ছড়া কাটল শুনেছ?

জগদম্বা ঘাড় নাড়ল।

তুমি ছেলে চাও না?

জগদম্বা হঠাৎ চোখ নামিয়ে নিল, আর চোখ তুলল না।

তিতুরাম অবাক হয়ে গেল, একি জগো, তুমি কাঁদছ?

জগদম্বার কান্না থামল না। তিতুরামের পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তিতুরাম বুঝতে পারল। সেই মেয়েদের চিরকালীন মা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা!

তিতুরাম বলল, জগো চুপ কর, চোখ মোছ। তুমি দুঃখ পেলে আমার খুব কষ্ট হবে।

জগদম্বার মত এমনি মেয়ে যেন তিতুরাম সারাজীবন দেখে আসছে। ওরা স্বামী চায় না, মা হতে চায়। মা হলে যেন ওদের সব আকাঙ্ক্ষা মিটে যায়। আবার মা হতে পারেনি এমন মেয়েও তিতুরাম দেখেছে।

তারাসুন্দরী অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। বাপের টাকা আছে। সুতরাং জামাই রাখার ক্ষমতা আছে। খরচ দিয়ে জামাইকে রেখে দিল। উদ্দেশ্য মেয়ে গর্ভবতী হলে জামাইকে ছেড়ে দেবে কিন্তু এদিকে মেয়ে আর গর্ভবতী হয় না।

রাখাল রায় একদিন রেগে গেল, বলল, আমার কি বাপের তেলকল আছে যে সারা বৎসর জামাই পুষবো ?

তারার মা বলল, তেলকল আছে বৈকি। তুমি তোমার বাপের বিষয় আশয় পাও নি ? তা থেকে না হয় মেয়ের জন্যে কিছু খরচ করবে।

রাখাল রায় আর কথা বলল না, গজ গজ করতে করতে চলে গেল।

এদিকে তারারও মেজাজ ভাল নয়। সে যেন মরীয়া। হঠাৎ একদিন বলল, বর, তুমি কোন কাজের নও!

তিতুরামের বয়স তখন কম। তার সম্মানে বাঁধল। সে রেগে বলল, আমার কি বউ একটা, যে এসব কথা বলছ ? কাল ঠিক আমি চলে যাব।

তারা তাড়াতাড়ি পা দুটি জড়িয়ে ধরল, বলল, না না তুমি রাগ কর না। আমার মাথার ঠিক নেই, তাই কি বলতে কি বলেছি। সেই তারা মা হয়েছিল। তিতুরামও ওর বাবার কাছ থেকে যথেষ্ট টাকা পয়সা পেয়েছিল। আর তারা এত খুশি হয়েছিল যে দুটো পা জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদেছিল।

সেই থেকে তিতুরাম জানে, মেয়েরা মা হতে পারলে সব চেয়ে খুশি হয়।

জগদম্বা খুব ভাল মেয়ে। ও মা হলে তিতুরামও খুশি হবে।

তিতুরাম বলল, জগো, চোখ মোছ, ওঠো আমি তো আছি, তোমার ভাবনা কি ?

জগদম্বা বলল, তুমি কালই চলে যাবে না তো!

এই কথায় তিতুরাম একটু চমকে উঠল। কাজ অনেক পড়ে আছে, চলে যাওয়াই উচিৎ কিন্তু মেয়েটার দুঃখ দেখে চলে যেতে ইচ্ছে করে না।

সে বলল, যাব না।

জগদম্বা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি বসো, আমি আসছি।

এইসব মেয়েরা যেন তিতুরামের কাছে একেবারে নতুন নয়। ব্যবসার খাতিরে টাকা পয়সা রোজগার করা হয় বটে কিন্তু মেয়েদের চিরাচরিত একই স্বভাব তার দেখা হয়ে গেছে। এরা যেন একই স্বভাব নিয়ে জন্মেছে। তফাৎ কিছু নেই। অবশ্য এসব কথা ভাল মেয়েদের বেলা বলা হয়।

যেমন হেমাঙ্গিনী। সেই রাতে তিতুরামদের বাড়িতে চলে এল। তিতুরামের ঘর আলাদা নয়। হেমা বলল, মাকে বলো আমরা আলাদা ঘরে শোব।

তিতুরাম বলল, আমি বলতে পারব না, তুমি বলো।

ঐ মেয়ে এমন, মার সামনে গিয়ে বলল, মা আমি কোথায় শোবো ?

মা বলল, তুমি আমার কাছে শোবে। তিতু ওর বড়মামার ঘরে শুক। দাদা বোধ হয় আজ আর এল না।

মা জানত, দাদা কোন শ্বশুর বাড়িতে রাত কাটাতে গেছে। এমনি তো প্রায়ই যায়।

কিন্তু হেমা বলল, মা তার চেয়ে আমি আর ও বড় মামার ঘরে শুই না।

মা এটুকুতেই বুঝতে পারলেন। তিনি হেমাকে ভালবাসেন। হেমার এই স্পষ্ট কথাও মার ভাল লাগল। মেয়েরা এমনি স্পষ্টভাবে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিলেই বুঝি মেয়েবা খুশি হয়।

সেই ব্যবস্থাই হল। হেমা ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিতে দিতে বলল, কি ভীতু ? মাকে বলতে পারলে না তো !

তিতুরাম অনেক মেয়ে দেখেছে, হেমার মত মেয়ে তখন একটিও দেখেনি। বলল, সত্যিই তোমার তুলনা হয় না।

হেমা দ্রুত কাছে চলে এল, ঘন হয়ে বসল, পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। আমি বাপু এসব পারি না। মা হয়ত কিছু মনে করলেন।

তিতুবাম বলল, না, না মা কিছু মনে করে নি। মা বরং তোমার স্পষ্ট কথায় খুশি হযেছে। মা তো চায় আমবা মিলেমিশে থাকি।

কি করে বুঝলে ?

তুমি যখন কথা বলছিলে, আমি তখন মার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মা তো সারাজীবন বাবাকে পায় নি। তিতু তার জন্ম ইতিহাসটা বলতে গেল।

হেমা তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, থাক্ থাক্ আর গুরুজনদের ঐসব ঘটনা বলতে হবে না।

সে রাত্রে হেমা একটুও ঘুমল না। শুধু সারারাত গল্প করেই গেল।

তিতুরামের কয়েকবার ঘুম পেয়েছিল কিন্তু ঘুমলো না। ওর যে কি ভাল লাগছিল ও বোঝাতে পারবে না।

কিন্তু পরদিন সকালে সেই সুখস্বপ্নটা আর থাকল না। ভোরবেলা মামা বাড়ি ঢুকেই হাঁকডাক।

জগদম্বা এসে পাশে বসল। কি যেন বলছিলে তখন ?

তিতুরাম আড়চোখে দেখল, জগদম্বার কালো মুখখানির উপর এই বয়েসে লাবণ্য টলমল করছে। একটু বিস্মিত হল তিতুরাম। মেয়েরা কত অল্পতে খুশি হয়।

ওরা যেন একেবারে শিশুর মত সরল। অথচ ওদের নিয়ে মানুষ কি ছিনিমিনি খেলা খেলে? অবশ্য মানুষ শুধু খেলা খেলে নি, বিধাতাও ওদের নিয়ে খেলেছেন। না হলে ওরা এত দুর্বল হল কেন?

জগদম্বা বলল, কি হল? এখনও বাটিটা যেমন দিয়েছি, তেমনি পড়ে আছে?

খাচ্ছি।

খাচ্ছি না। খেয়ে নাও। এই বলে জগদম্বা হাতে তুলে দিল।

তিতুরাম খেতে খেতে বলল, এত যত্ন তুমি আর কতদিন করবে জগো!

তুমি থাকো না। দেখবে আমি যত্ন করি কিনা!

এই কথায় তিতুরামের হাসি পেয়ে গেল। সব বউ তাকে থাকতে বলে। সব বউ চায় স্বামীকে নিজের করে রাখতে। ধর যদি এখানে জগদম্বাদের বাড়িতে থেকে গেল। আর মাঝে মাঝে বেরিয়ে শ্বশুরবাড়িগুলো ঘুরে এল। কিছু পাওনা গণ্ডা পকেটে পুরে এখানে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকল কিন্তু জগদম্বা কি তা সহ্য করবে? না ঐ জগদম্বার বাবা করবে? বলবে তুমি ব্যবসা ঠিক রাখবে আর এখানে এসে বসে থাকবে?

একবার এমনি একটা কাণ্ড করতে গিয়েছিল। নয়নতারাকে খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। আর তার বাবার অবস্থাটাও ভাল।

তিতুরাম সেই বাড়িতে দিন পনেরো ছিল।

নয়নতারা বলল, তুমি আর দিনরাত টো টো করে ঘুরো না। বাবা বলেছে, জামাই থাকলে তাকে একটা দোকান করে দেবে। তা তারিণীচরণ দিত। তারিণীচরণের নিজেরই দু-দুটো দোকান ছিল কিন্তু তিতুরামের মন টিঁকল না। পনেরদিন যাবার পর মনটা ফাঁকা লাগতে লাগল, নগদ কিছু হাতে আসছে না। তাছাড়া এমন বসে থাকলে ব্যবসা অচল হয়ে যাবে। ব্যবসারও তদ্বির তদারক করতে হয়। এইজন্যে তিতুরাম আসছি বলে একদিন খাতা বগলে করে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু বাড়ি আসতে নয়নতারার অন্যমূর্তি। নয়নতারা বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

একটু ঘুরে এলাম।

নয়নতারা বলল, ঘুরে এলে না, শ্বশুরবাড়িগুলোয় হাজিরা দিয়ে এলে?

তিতুরাম আমতা আমতা করে বলল, ঠিক তা নয়।

নয়নতারা বলল, আবার মিথ্যে কথা! ভেবেছ আমি বুঝি কিছু জানি না। নতুন গ্রামের ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি যাও নি?

তুমি কি করে জানলে নয়ন?

থাক্ আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। গিয়েছিলে তো!

তিতুরাম বলল, অনেকদিন ধরে খবর পাঠাচ্ছিল। তাছাড়া মেয়েটা অসুস্থ।

তাই যদি যাবে ঠিক করেছ, তাহলে এখানে বসে আছ কেন, যাও ?

নয়ন, শুধু শুধু তুমি রাগ করছ ?

না, আমি রাগ করি নি। আমার কপাল যে ভাল নয়, তা তো জানি। বাবা বলল, জামাই ঘুরে ঘুরে শুধু বিয়ে করে বেড়াচ্ছে, ও তো পয়সার জন্যে এসব করে। ওকে যদি বাড়িতে রেখে দেওয়া যায়, আর যদি কাজের একটা ব্যবস্থা করে দিই, তাহলে বেঁচে যাবে।

তোমায় তো আমরা সাহায্য করতেই চেয়েছি।

তিতুরাম বলল, নয়ন শুধু শুধু তুমি রাগ করছ ? আমি তো তোমাদের কথা শুনেই রয়েছি।

নয়ন বলল, হ্যাঁ আছ বটে কিন্তু তোমার ব্যবসা তুমি ঠিক রেখেছ। আবার দেখব, দু'চারদিন পরে আর এক জায়গায় উড়ে গেছ।

না, না নয়ন, তুমি বিশ্বাস কর, আর কক্ষণো যাব না।

নয়ন বলল, না তোমায় বিশ্বাস নেই। তুমি যখন একবার গেছ, তখন বার বার যাবে। মানুষের স্বভাব একবার নষ্ট হলে আর ভাল হয় না।

তিতুরামের রাগ হয়ে গেল। মেয়েছেলের এত স্পর্দ্ধা তার সহ্য হল না। বলল, বেশ, আমার স্বভাব খারাপ। তুমি তো ভাল !

নয়ন বলল, আমি ভাল কিনা, দেখতে পাচ্ছ না ! হঠাৎ নয়ন চিৎকার করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি ভাল কিনা দেখতে পাচ্ছ না ! আমার কি খারাপ দেখেছ ?

তিতুরাম তাড়াতাড়ি নয়নতারাকে চুপ করাতে গেল। আহা, তুমি শুধু শুধু কাঁদছ কেন ? আমি তোমায় খারাপ বলিনি।

নয়ন চোখ মুছতে মুছতে বলল, বল নি আবার। বললে তো। আমি কিছু বুঝি না। আমার বুঝি বয়স হয়নি।

তারিণীচরণ কোথায় ছিল। কাছে এসে বলল, কি হয়েছে রে নয়ন, কাঁদছিস কেন ?

নয়ন বলল বাবা দেখ না, তোমার জামাই আমায় খারাপ, নষ্ট বলছে।

তিতুরাম কিছু বলতে গেল, তার আগেই তারিণীচরণ তিতুরামের গলায় হাত দিয়েছে। বেরো, বেরো বলছি, এত বড় কথা। আমার মেয়েকে খারাপ বলে। মেয়ের আমি আবার বিয়ে দেব, তবু এ জামাই আনব না।

নয়ন বলল, ওকি কথা বাবা ? আবার আমার কি করে বিয়ে দেবে ? হিন্দুর মেয়ে না !

তারিণীচরণ তখন অন্য মেজাজে চলে গেছে। বলল, বিয়ে না হয়, আমি

দেব। তুই কিছু ভাবিস না নয়ন। এ জামাই চাই না। নয়ন কেঁদে উঠল।

তিতুরাম কিছু বলতে গেল কিন্তু তার কথা কেউ শুনল না। শ্বশুরবাড়ি থেকে গলা ধাক্কা খেয়ে তাকে চলে আসতে হল। তারিণীচরণ এমন গলা টিপে ধরেছিল, সেই ব্যথা একমাস ছিল। তাই শ্বশুরবাড়িতে চিরজীবন ধরে থাকার সংকল্প তারপর থেকেই তার ঘুচে গেচে। দু-পাঁচদিন যে কোন বাড়িতে থাকে না এমন নয়, খরচ দিলেই থেকে যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর আবার তার নিজের পথে।

জগদম্বা বলল, কি ভাবছ ?

তিতুরাম মুচকি হেসে বলল, তোমার কথা।

জগদম্বা বলল, আহা, আমার কথা ভাবছ না ছাই। কিন্তু তবু জগদম্বার কালো মুখে একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠল। তিতুরাম তাই দেখে বলল, বিশ্বাস করলে না, না !

জগদম্বা চোখ নামাল, কথা বলতে পারল না। তিতুরামের খুব হাসি পেল। বয়স তার পঞ্চাশের কোটা যায় যায়। তবু রমণী ভোলাতে সে এখনও পটু। অবশ্য এটা ওর ব্যবসা। ব্যবসার কোন বয়স নেই। ব্যবসায় যত ফন্দি ফিকির খাটাবে তত ব্যবসার অবস্থা ভাল হবে। কিন্তু এ ব্যবসা তো যে সে ব্যবসা নয়। বিয়ে ব্যবসা। হৃদয় নিয়ে খেলা। সেই হৃদয় আজ পুরোনো হয়ে মরচে ধরে যাচ্ছে। তবু এখনও রসের যোগান দিয়ে চলেছে।

তিতুরাম জগদম্বাকে কাছে টেনে নিল। জগদম্বা চাপাস্বরে বলল, দরজাটা খোলা রয়েছে না। ছোটমা এসে পড়তে পারে। দরজাটা দিয়ে আসি। জগদম্বা উঠে যেতেই বাইরে থেকে কতকগুলি নারীকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল।

তিতুরাম চমকে উঠল, কি ব্যাপার ?

জগদম্বা বলল, বাবা নিশ্চয় বেরোচ্ছে। দাঁড়াও আমি দেখে আসি।

জগদম্বা চলে গেলে তিতুরাম অবাক হয়ে বাইরের সব কথা শুনতে লাগল। খুব বেশিদূর নয়, সম্ভবত উঠোনে। একাধিক নারীকণ্ঠ ও একটি পুরুষের তর্জন 'গর্জন আসছিল। কথাগুলি জোড়া দিয়ে বোঝা গেল, জগন্নাথ তাড়ি খেতে যেতে চায়, তার বউরা যেতে দেবে না। তার বউরা সবাই তাকে চেপে ধরেছে, জগন্নাথ পালাতে চাইছে। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, ছোট, ঐ পাশটা চেপে ধর। না, না, হাতটা মুচড়ে ধরিস না। প্রমদাদি, বুকের ওপর উঠে বস। তোমার শরীরের ভারে উঠে পালাতে পারবে না। তিতুরামের খুব কৌতুক লাগছিল। এরা এই কটা নারী জোয়ান লোকটাকে নিয়ে করছে কি ? দেখবার ইচ্ছা জাগল কিন্তু দেখতে গেলে ঐ মেয়েগুলির কাছে অপরাধী হয়ে যাবে বলে গেল না। ও গেলেই মেয়েগুলি ঘোমটা দিয়ে, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাবে।

হঠাৎ মেয়েগুলি সব একসঙ্গে হায় হায় করে উঠল। এত করেও পারা গেল না ধরে রাখতে।

কথাও শোনা গেল। ছোটটাই কোন কাজের নয়, বললুম, হাতের তাবিজটা চেপে ধরে রাখ।

ছোট বলল, বাহ্ আমি তো ধরেছিলুম।

ভারীগলার মহিলা বলল, তাহলে গেল কেমন করে ?

কেমন করে ?

সুন্দর গলার একটি মেয়ে বলল, তুমি প্রমদাদি, শুধু শুধু অলকাকে দোষী করছ ? অলকার ক্ষমতা কি ঐ জোয়ান মানুষকে ধরে রাখে।

প্রমদা বলল, মেয়েদের কাছে পুরুষ যতই জোয়ান হোক না কেন কাৎ হতে কতক্ষণ।

অনেকগুলি নারী একসঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠল। হঠাৎ কে যেন জগদম্বার দিকে তাকিয়ে বলল এই মেয়ে, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মায়েদের কথা কি শুনছিস ?

আব একজন বলল, মেয়েটা একেবারে হাঁদা। বর ঘরে রয়েছে, ও বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাণ্ড দেখছে।

সুন্দর গলাব মেযেটি বলল, বর তো একেবারে খেংরাকাঠির মাথায় আলুর দম। মেয়ের সঙ্গে সে পারবে ? জগদম্বা হাসতে হাসতে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সে একটা যুগ। সেই যুগে শহর, গ্রাম বলে কিছু ছিল না। ইংরেজরা যেমন রাজত্ব নিয়ে ব্যস্ত ছিল, দেশের মানুষ টাকা আর বিলাস জীবন। টাকা হলেই জুড়ি গাড়ি চড়ে চলে যেত বাগবাজার কিম্বা সোনাগাছিতে। সেখানেই কেটে যেত সারারাত। ফেরবার সময়ে শুধু মনে থাকত দুখানি সুন্দর গৌরবর্ণ পা।

নবনীধর শুধু একা ছিল না। এমনি নবনীধর তখন সারা কলকাতা জুড়ে। আবার নিবারণও একলা ছিল না। অসংখ্য নিবারণ তখন মনিবদের খিদমৎ খাটবার জন্যে সর্বদা তৈরী। নিবারণদের দোষ দেওয়া যায় না। যুগে যুগে এমনি নিবারণ বহু জন্মেছে। ওদের যে টাকা দরকার। ওদের যে টাকা করতে হবে! টাকা না হলে বড়লোক হওয়া যাবে না। নিবারণের যে বড়লোক হওয়ার বড় ইচ্ছে।

সেই নিবারণ যখন নবনীধরকে এসে জানাল হুজুর, জিনিসটি হাতছাড়া হয়ে

গেল। নবনীধর তখন রেগে গেল। নবনীধর মদের গেলাস নিয়ে বসেছিল, সেটা ছুঁড়ে মারল নিবারণের দিকে।

নিবারণের কপাল কেটে গেল। রক্ত বেরোতে লাগল। নিবারণ বলল, হুজুর আপনি আমায় মারলেন?

নবনীধর বলল, বেশ করেছি। আমার সামনে থেকে দূর হ।

নিবারণের কপাল বেয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু নবনীধর দেখেও দেখল না। নবনীধরের তখন কিছু ভাল লাগছিল না। নবনীধর গেলাস অভাবে বোতলটাই গলায় ঢালল। ঢক্ ঢক্ করে শুধু একটা শব্দ হল।

নিবারণের সেই দেখে খুব একটা কষ্ট হল। এরকম কোনদিন তার হয় নি। এতদিন মনিবের সেবা করেছে। আজকের মত এমন বেকুব সে কখনও হয় নি। ওই ঠাকুর মশাইয়ের জন্যে তার এমনি অবস্থা হল। ঠাকুরমশাই এমনি না করলে হুজুরেরও এত রাগ হত না।

নিবারণ বলল, হুজুর এবারের মত আমায় ক্ষমা করে দিন। মেয়েটা খুব তেঁয়েটে ছিল। ওকে আনলেও আপনার খুব সুবিধে হত না।

নবনীধর বলল, যা জল দিয়ে কপালটা ধুয়ে ফেল। আর ওপরে ওষুধ আছে লাগিয়ে দে।

নবনীধর একটা দশ টাকার নোট নিবারণের দিকে ছুঁড়ে দিল। নিবারণ সেই পেয়ে সব ভুলে গেল।

নিবারণ চলে যাচ্ছে দেখে নবনীধর বলল, কোচোয়ানকে গাড়ি বের করতে বল্।

হুজুর এখন কি এই রাতে আপনি বেরবেন?

নবনীধর বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, তোকে যা বলছি তাই কর। কতদিন বলেছি না প্রশ্ন করবি না।

সত্যিই নিবারণের বড় স্বভাব খারাপ। কেবল প্রশ্ন করে। কিন্তু নিবারণ কেন প্রশ্ন করে নবনীধররা জানে না। নবনীধরের কিছু হলে যে নিবারণের বড়লোক হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

নিবারণ যে বড় গরীব। নিবারণ যদি টাকা না করতে পারে তাহলে দেশে যে তার ছেলে বউ না খেয়ে মরবে।

নিবারণ কপালটা ধুয়ে ওষুধ আর লাগালো না, দশটাকার নোটটা সেই কপালে চেপে ধরল। আবার তাড়াতাড়ি আতঙ্কে নোটটা সরিয়ে নিল। যদি রক্ত লেগে যায়? রক্ত লাগলে যে সব মাটি হয়ে যাবে। তখন যে টাকাটা চলবে না। টাকা না চললে নিবারণ এত যে মেহনত করে তবে কিসের জন্যে?

সেদিন হেমাকে পাশে নিয়ে শুয়ে তিতুরামেরও সেই কথা মনে হচ্ছিল। তিতুরামের মনে হচ্ছিল, সে যেন আর কোন বিয়ে ব্যবসা করে না। একটাই বিয়ে

করেছে, বউকে নিয়ে সংসার করে, আর চাকরি করে কোন জমিদারীর সেরেস্তায়। হেমা বাড়ি এলে পা ধুইয়ে দেয়। সামনে বসে খাওয়ায়। এটা খাও সেটা খাও বলে। ওদের জীবন খুব সুখের। এই সব ভাবনাই মনের মধ্যে ছিল। এই সব ভাবনাই মনে ধরে তিতুরাম ঘরের বের হয়েছিল, এই সময়ে রাখহরি মামা এসে তার হাত চেপে ধরল।

তিতুরাম যে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, সেই ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। রাখহরি মামা বলল, তুই এমন করলি কেন? আমার মান সম্মান কোথায় গেল জানিস? আমায় ঐ নিবারণ কি বললো?

আমি অন্যায় করেছি মামা, ক্ষমা করে দাও।

রাখহরি মামা বলল, অন্যায়ের কথা হচ্ছে না। টাকার কথা হচ্ছে। তুই আড়াইশো টাকা গুণে গুণে নিস নি!

তিতুরাম অস্বীকার করতে পারল না। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলল, সে টাকা এনে দিচ্ছি।

রাখহরি মামা বলল, তা নয় এনে দিলি কিন্তু আমি যে ঐ সদগোপটার কাছে অপমানিত হলাম তার কি হবে? সদগোপটা আমায় কত মান্যিগণ্যি করত, তোর জন্যে মারতে এল! তুই হেমাকে দিয়ে দিলে এমন হত?

তিতুরাম বলল, মামা, আমি টাকাটা এনে দিচ্ছি।

রাখহরি মামা রেগে গেল, বলল, টাকা, টাকার কথা তোকে কে বলছে? তুই আমার কথার জবাব দে। হেমাকে দিলি না কেন? তোর তো কত বউ। একটা বউকে দিয়ে দিলে কি হত? একটা বউ গেলে নিশ্চয় ক্ষতি হত না। আর যে পাঁচশ টাকা হাতে পেতিস সেটা বড় হত না? পাঁচশ টাকা বড় না একটা বউ বড় হল?

হেমার কথা তখনও তিতুরামের মনে পড়ছিল। হেমার কথা, হাসি, সান্নিধ্য সবই যেন শরীরে মাখামাখি হয়ে আছে। হেমাকে যদি সে ঐ বাঘের খপ্পরে ঠেলে দিত, তাহলে কি সারারাত এমনি তাকে কাছে পেত?

রাখহরি মামা বলল, বেশ হয়েছে। তুই যাতে অনেক টাকা করতে পারিস তার জন্যে আমি চেষ্টা করেছি। তুই যখন টাকা চাস না, তখন আর আমার কিছু বলার নেই। এরপর যদি কখনও বলবি, মামা আমার টাকা কি করে হবে, তখন আমি কিছু জানি না। নিজের পায়ে যদি এইভাবে কুড়ুল মারিস তার জন্যে আমি কি করতে পারি?

তিতুরামের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। টাকা তার দরকার নেই তা নয় কিন্তু মামা চটে গেলে তার সব পণ্ড। তার ব্যবসা কি করে চলবে? কিন্তু তাই বলে হেমাকে দিতে ইচ্ছে করে না। হেমাকে না নিয়ে মামা অন্য বউদের কথা বলে না কেন?

তিতুরাম বলল, মামা বসন্তপুরের সুখদাকে দেব ? বসন্তপুরের সুখদাকে তো দেখতে ভাল।

এই মামাই একদিন আহ্লাদে আটখানা হয়ে এসে বলেছিল, তিতু, এতদিনে একটা তোর সুন্দরী বউ জুটল, এমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।

মা শুনে বলল, বড়দা, তাহলে ঐ মেয়েটাকে এনে দাও। আমি নিয়ে ঘর করি।

মামা শুনে বলল, গিরি তোর সব তাতেই কথা বলা অভ্যেস। ঘর করার জন্যেই কি কথাটা বলছি ? মেয়েটি দেখতে ভারী সুন্দরী। এমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। আর তিতু তো এমনি সুন্দরী মেয়ে একটিও বিয়ে করে নি।

মা বলল, সেইজন্যেই তো বলছি। তিতু যদি মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে আসে ক্ষতি কি ?

তা সত্যিই মেয়েটিকে দেখে চোখ ফেরানো গেল না। ভগবান নারী শরীরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব দান করেছে, যাতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তিতুরামও বিস্মিত হল। আর স্বভাব বড় মিষ্টি। এ যেন চেহারার সঙ্গে মিল করেই স্বভাব সৃষ্টি হয়েছে।

শুভদৃষ্টির সময়ে চোখ তুলে তাকাল। অধরে এক টুকরো ক্ষীণ জ্যোৎস্নার মত হাসি। হাসি দেখে মনে হল, সারা আকাশ জুড়ে যেন ঐ এক টুকরো হাসিই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তিতুরামের ইচ্ছে ছিল, বিয়ের পরও কিছুক্ষণ থাকবে, কিন্তু মামা দিল না। মামা বলল, ভুলে যাস না এটা তোর ব্যবসা। তুই যে থাকবি সুখদার বাবা নরহরি খরচা দেবে ?

তিতুরামের রাগ হয়ে গেল, বলল, তুমি মামা সব সময়ে ব্যবসা কর। ব্যবসা ছাড়া বুঝি মন বলে কিছু নেই ?

মামা বলল, না। মন দুর্বল করলেই ব্যবসা মাটি।

কিন্তু মাঝে মাঝে তিতুরামের সত্যিই মন দুর্বল হয়ে যায়। ও মামার কথা না শুনেই সেই বিয়ে বাড়িতে একদিন ছিল।

সুখদা সুখী হয়েছিল। সুখদার ঐ সুন্দর মুখটি দেখতে দেখতে তিতুরাম তার ব্যবসার কথা ভুলে গিয়েছিল।

তিতুরাম গোপনে ওদের টাকা সাহায্য করত। এসব কথা মামা জানে না। জানলে আর রক্ষে রাখত না। ওই সুখদা তিতুরামের এত ভক্ত হয়ে উঠেছিল যে কলকাতায় ওকে পাঠালে একটুও সে অরাজী হবে না।

কিন্তু মামা বলল, হেমার কাছে সুখদা! তুই কি যে বলিস তিতু! তোর দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোর মাথায় কিছু নেই!

সত্যিই তিতুরামের মাথায় কিছু নেই। তিতুরাম সেটা অস্বীকার করতে পারে না।

হেমা এ বাড়িতে থেকে গেল। হেমা আবার মায়ের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠল। মায়ের কাছ থেকে সংসারের সব দায়িত্ব কেড়ে নিল।

মা বলল, বৌমা, তুমি এত খেটো না, তোমার সোনার অঙ্গ কালি হয়ে যাবে। হেমা বলল, হোক। তাবলে তোমাকে মা আমি খাটতে দেব? তোমার বয়স হচ্ছে না। তুমি অতো খাটবে কেন?

মার চোখে জল এসে গেল। মার বুঝি মনে পড়ে গেল তার প্রতি সারা জীবন ভায়েদের অবহেলা। মার মুখে আর কথা যোগাল না।

হেমা রাত্রি বেলা ঘরে ঢুকে বলল, তোমার লজ্জা করে না মাকে দিয়ে এত খাটাতে! তোমার মামারাও কি মানুষ বাপু?

এইভাবে যদি জীবনটা চলে যেত তাহলে হয়ত দুঃখ থাকত না তিতুরামের। কিন্তু এইভাবে যে জীবন যায় নি তার সাক্ষী সে নিজে। এই সব কথায় ভাগ্যটাই মনে পড়ে। ভাগ্য যদি ভাল হত, তাহলে এই জীবনই কত মধুর হত। রাখহরি মামা তার জন্যে এত করে কিন্তু হেমাকে দেবার জন্যে পাগল হল, হেমার যেন কোন কিছু তার ভাল লাগত না। আর চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে তাকে দেখত। হেমাকে যেন সে ভষ্ম করে দিতে চাইত। হেমা যেন এই দৃষ্টি দেখে কুঁকড়ে যেত। হেমা বলত, তোমার মামা আমাকে এমন চোখে দেখে কেন বলত? তিতুরাম বলত, কিরকম চোখে দেখে?

হেমা বলত, আহা, তুমি যেন কিছু জান না।

তিতুরাম বলত, সত্যি বিশ্বাস কর। তুমি বল না, কেমন চোখে দেখে?

হেমা দেখাত রাখহরি মামার চাহনীটা। তিতুরাম আর জবাব দিতে পারত না। তিতুরাম আর কি জবাব দেবে? সবই তো তার জানা? তিতুরাম বলত, তুমি এসব ভ্রূক্ষেপ কর না। তুমি তো আর মামার পয়সায় খাও না আমার পয়সায় খাও।

হেমা বলত, তা হোক তোমায় তো বললাম, আমার বাবার কাছে চলে যাও। আমার মনে হয়, আমার বাবার কাছে থেকে মাসোহারা পায় নি বলেই চটে আছে।

তিতুরাম বলত, এ তোমার ভুল ধারণা। মামা তাতে চটবে কেন? খরচ তো আমার। আমি তোমার জন্যে সংসার খরচ দিচ্ছি না। তুমি মামাকে তোয়াক্কা করবে কেন?

হেমা বলত, তা হোক, তুমি বাবার কাছে চলে যাও।

তিতুরাম যেত না আর হেমার বাবা শিবনাথ হয়ত ভেবে নিয়েছে, হেমা তার

নিজের ঘরে আছে। মেয়েদের নিজের ঘর তো শ্বশুর বাড়ি। শিবনাথের বুঝতে বাকি থাকে নি, মেয়ে তার স্বামীর ভালবাসা পেয়েছে।

পাতুল গ্রাম খুব ছোট নয়, আবার বড়ও নয়। সে গ্রামের বাসিন্দারা পরস্পরকে বেশ ভালমতই চেনে। ব্রাহ্মণ কায়স্থরা আলাদা। তবু দেখা সাক্ষাৎ হয়ই। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে সর্বত্র দেখা হয়ে যায়। যে দেখা করব না বললেও লুকিয়ে থাকা যায় না। রাখহরি মামা লুকিয়ে থাকার হাজার চেষ্টা করেও পারল না, ঠিক নিবারণের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নিবারণ বলল, কি ঠাকুরমশাই, আমার পাঁচশ টাকা একেবারে হজম করে দিলে? বাড়িতে গেলেও দেখা পাই না পথে ঘাটেও দেখতে পাইনে।

রাখহরি মামা আমতা আমতা করে বলল, তুমি বাড়িতে গিয়েছিলে নাকি! কই আমায় তো বাড়ির লোক কিছু বলে নি।

নিবারণ বলল, ঠিক বাড়িতে যাই নি। বাড়ির সামনে দুদিন দাঁড়িয়েছিলাম।

নিবারণ যে বাড়িতে যেতে পারে না, রাখহরি মামা সেটা জানে। পণ্ডিত মামা দেখলেই তাড়া করে।

রাখহরিমামা বলল, তা কি জন্যে খুঁজছ?

নিবারণ বলল, কি জন্যে খুঁজছি জানো না? পাঁচশ টাকার কি করলে?

রাখহরিমামা বলল, তুমি টাকা চাও না, জিনিস চাও?

নিবারণ বলল, যা খুশি হয় দাও কিন্তু তাড়াতাড়ি কর। তুমি দেরী করলে আমার মনিব আবার আমায় মারবে। এই দেখ না তোমরা তো কেটে পড়লে কিন্তু আমার মনিব আমার কপালটার কি অবস্থা করেছে।

রাখহরি মামার দেখে খুব দুঃখ হল। বলল, সত্যি নিবারণ তুমি কিছু মনে কর না। আমার ভাগনেটার জন্যেই এসব হল।

নিবারণ বলল, তুমি ভাগনেকে বিশ্বাস করলে কেন? তবে তোমার ভাগনের বউটি বেশ। আমার মনিব ওটি পেলে খুব খুশি হত, মনিব তো আমার খুব ভাল লোক। আমার মনিবের মত মানুষ কলকাতায় দুটি নেই।

রাখহরিমামা বলল, নিবারণ আমি তোমায় অন্য জিনিস দেব, ভাগনে বৌকে দিতে পারব না।

নিবারণ বলল, কেন? ভাগনে বৌটি তো খুব ভাল। বেশ সোন্দর দেখতে। আমার মনিব পেলে খুব খুশি হবে। আমার মনিব খুশি হলে আরও টাকা দিয়ে দেবে মশাই।

তুমি টাকা চাও না ঠাকুরমশাই ?

রাখহরিমামা বলল, না নিবারণ, আমার ভাগনে তাকে দেবে না।

নিবারণ বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ রাখহরির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, তোমার ভাগনে বেশি টাকা পেলেও তাকে দেবে না!

রাখহরিমামা বলল, সেইরকমই তো দেখলাম। ভাগনে আমায় টাকা ফেরৎ দিয়েছে।

নিবারণ বলল, ঠাকুরমশাই তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ না। না হয় আরও একশ বেশী দেওয়া যাবে। মনিব খুশি হলে টাকার কথা ভাবতে হবে না।

রাখহরিমামা বলল, আচ্ছা। কিন্তু খুব বেশী আশা দিতে পারব না।

হঠাৎ দেখা গেল, রাখহরিমামা বাড়িতে বসে আছে। আর হেমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছে! হেমা দৌড়ে দৌড়ে মামার ডাকে মামার ঘরে গিয়ে ঢুকছে।

মা বলল, দেখলি তিতু, আমি বলি নি দাদা খারাপ লোক নয়। আমি তো তাকে ছোটবেলা থেকে দেখছি।

তিতুরামেরও খুব ভাল লাগল। মামার ব্যবহারে তার ওপর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠল।

হেমাকে মামা অনেক কিছু দেয়। শাড়ি গয়না। একদিন একটা খুব সুন্দর শাড়ি নিয়ে হেমা দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, দেখো, মামা আমায় কি সুন্দর শাড়ি দিয়েছে। এর দাম কত জানো? কুড়ি টাকা। মামা বলল, আজকালকার বাজারে কুড়ি টাকায় একটা তালুক কেনা যায়।

তিতুরাম শাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল, বেশ ভাল শাড়ি। বলল, পরতো। তোমায় কেমন মানায় দেখি।

হেমা বলল, ইস তোমার সামনে পরবো না হাতি। মামা বলে আমায় পরে দেখাতে বলেছে। তিতুরামের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

হেমা তাড়াতাড়ি বলল, তুমি রাগ করলে। রাগ কর না লক্ষ্মীটি। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল, এই রাতত্তিরে তোমায় পরে দেখাব।

হেমা সেই শাড়ি পরে চলে গেল। মামা এমনি পর পর বহু জিনিস দিয়ে হেমাকে একেবারে বশ করে ফেলল।

বরং তিতুরাম মামার নামে কিছু বললেই হেমা তেড়ে আসে। বলে, খবরদার মামার নামে কিছু বলবে না। মামার মত মানুষ হয় না। তোমার তো আরও মামা আছে, সে সব মামারা আমায় কিছু দেয়?

সত্যি কথা, মেজমামা শুধু হেমাকে হুকুম করে। বলে হেমা ঐ পুঁথিটা খুঁজে নিয়ে এস তো। এক গ্লাস জল গিরির কাছ থেকে নিয়ে এস। আর দেখতো ভাত হয়েছে কিনা, আমায় আবার বেরতে হবে।

সেজমামাও হুকুম করে। তবে মেজমামার মত অত নয়। মাঝে মাঝে বলে এমনি একটি বউ বাড়িতে থাকলে খুব ভাল লাগে। যেন ঘরের লক্ষ্মী। আর ছোটমামা তো হেমাকে দেখে আড়ালে তিতুকে বলে, রাত্রে দুজনে এক সঙ্গে শুচ্ছিস তো!

ছোটমামা কেন হেমার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলে না তিতুরাম বুঝতে পারে না। ছোটমামা তো লজ্জা পাওয়ার লোক নয়! স্বর্ণমঞ্জরী, কনকলতা দুজনকে নিয়ে যে ছোটমামা জীবন চালাচ্ছে।

এই অবস্থার মধ্যে একদিন হেমা জানাল, জানো, আমি কাল মামার সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।

বেড়াতে? তিতুরাম জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, মামা বলেছে, কলকাতায় কত কিছু দেখাবে। তুমি তো সেবার কিছুই দেখালে না। শুধু ঘোরালে।

তিতুরাম বলল, কখন যাবে?

হেমা বলল, সকালবেলা। কেন তুমি যাবে নাকি? কিন্তু মামা বলেছে, আমায় একা নিয়ে যাবে। তোমায় নিয়ে যাবে না।

তিতুরাম বলল, মামা এই কথা বলেছে। হেমা বলল, মামা না বললে কি আমি তোমায় মিথ্যে কথা বলছি নাকি? আমি তো মামাকে বলেছিলাম তোমাকেও নিয়ে যেতে।

মামা বলল, না। এবার তুমি চলো, পরের বাবে আমি তিতুকে নিয়ে যাব।

মামা আর কি বললো?

মামা বলল, আমরা সকালবেলা যাব। আমার এক বড়লোক বন্ধু আছে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে তারপর কলকাতা দেখতে যাব।

তিতুরাম মামার ঘরে এল।

ভাবনার যেন শেষ নেই। ভাবতে শুরু করলে একেবারে মহাভারত হয়ে যায়। মহাভারত কি এত বড়? তিতুরাম মেজমামার কাছে মহাভারত দেখেছে! আরও যতদিন বাঁচবে, কত যে কাহিনী জমবে সে জানে না।

পাঁচ ছদিন পরে বেরবার মতলব করছে, জগন্নাথ বলল, জামাই আর কদিন থেকে যাও। শরীরটা একটু সুস্থ হয়েছে, আর কদিন থাকলে আরও ভাল হবে।

তিতুরাম দেখছিল, শরীর সত্যিই বেশ হালকা হয়েছে। এখন চলা-

ফেরায় আর কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য এর সব কৃতিত্বই ঐ জগদম্বার। জগদম্বা এই কদিন ধরে স্বামীর যে সেবা করেছে তার তুলনা হয় না।

জগদম্বা দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল, চোখ দুটি জলে ভরে গেছে, ওর জন্যে তিতুরামের কষ্ট হতে লাগল।

জগন্নাথ বলল, জামাই, মেয়ে আমার মা হলে খবর দিলে একবার এস।

মা? তিতুরাম আবার চমকে উঠল। সে কি মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেল নাকি? অবশ্য জগদম্বা মা হোক এই কামনা তো তারও ছিল। কিন্তু সে কি বাবা হতে চেয়েছে?

জগদম্বার মায়েরা সব এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা আর আগের মত লজ্জায় দূরে দূরে থাকে নি, বরং দুদিন পর থেকেই জামাই জমাই করে এগিয়ে এসেছে।

ছোটমা অলকার বয়স সব চেয়ে কম। আর বেশ ডেঁপো মেয়ে। কিন্তু ছড়া বাঁধে ভারী সুন্দর। মুখে মুখে ছড়া বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দেয়। একদিন জগন্নাথ তাড়ি খেতে না গিয়ে সন্ধ্যের সময়ে আসর বসাল। আর অলকা একটার পর একটা ছড়া কাটতে লাগল।

ছড়াগুলো বেশ রসাল। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

'মা গো মা তোমার জামাই এসেছে।
আম গাছ আর জাম গাছের মধ্যে বসেছে
পায়ে দিতে খড়ম দিলাম, কানে ঝুলাইছে।
পাও মুছিতে গামছা দিলাম, মাজায় বাঁধিছে।'

জগন্নাথ বলল, কি হে জামাই এসব তুমি কর নাকি?

তিতুরাম জগদম্বার দিকে তাকাল। জগদম্বা লজ্জায় মাথা হেঁট করে নিয়েছে। তিতুরাম বলল, সে কথা ছোটমাকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ছোটমা তখন আবার ছড়া কাটল।

'চিঠি পাঠাই, ঘোড়া পাঠাই তবু জামাই আসে না,
জামাই ছেলের বড় আদর একদিন বৈ থাকে না
আর একদিন থাকো জামাই বসতে দিব তুলার পাটি,
খেতে দিব গুয়া পানটি।'

হাসতে হাসতেই সবাই গড়িয়ে পড়ল। প্রমদা বলল, থাম্ ছোট, আমি মোটামানুষ তুই দেখতে পাচ্ছিস না। হাসতে গেলে পেটে খিল ধরে যায়। আর হাসালে কিন্তু তোকে সারারাত ধরে পেটে হাত বুলিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু যে ছড়া কাটছে সে গম্ভীর। সে অন্যসময়ে হাসে কিন্তু এখন একেবারে গম্ভীর। গম্ভীর স্বরে আবার শুরু করল।